ঘনাদা নিত্য নতুন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই আশ্বিন,
১৮৮৭ শকাব্দ

প্রচ্ছদসজ্জা :
ও
অঙ্গসজ্জা
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর : শ্রীশুকদেব চন্দ্র চন্দ্র
বিবেকানন্দ প্রেস
১।১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

ভবানী মুখোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু

জল

কীসে যে কী হয় কিছুই বলা যায় না।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের উপমাই লোকে দেয় কিন্তু শুকনো খটখটে আকাশ থেকেও যে বর্ষণ কখনো কখনো হয় সে কথা মনে রাখে ক'জন!

এ রকম বর্ষণ এই আমাদের ভাগ্যেই সেদিন হয়েছে, একেবারে যাকে বলে অভাবিত।

অভাবিত ছাড়া আর কি বলা যায়! প্রাণান্ত সাধ্য-সাধনা করেও যাঁকে এতটুকু গলাতে পারি নি গত তিনমাস, নিজের তিনতলার টঙে যিনি প্রায় অবাঙ্‌মানসগোচর হয়ে আছেন, উঠতে নামতে কচিৎ কদাচিৎ দেখা হলে যাঁর দৃষ্টিতে হাওয়ার মত আমরা হঠাৎ স্বচ্ছ হয়ে যাই, দোতালার আড্ডাঘর থেকে কখনও পাড়া-কাঁপানো শোরগোল তুলে কখনও বা অনুকূল বাতাসে সদ্যভাজা হিঙের কচুরি কি চিংড়ির কাটলেটের সুবাস ছড়াবার ব্যবস্থা করেও যাঁকে একবার একটু কৌতূহলভরেও ওপরের ছাদ থেকে উঁকি দেওয়াতে পারি নি, সেই ঘনাদার হঠাৎ নিজে থেকে বিনা নিমন্ত্রণেই আড্ডাঘরে এসে সহাস্য-বদনে নিজের আরাম-কেদারা দখল কে কল্পনা করতে পেরেছিল!

শুধু ঘরে ঢুকে বসা তো নয়, প্রায় ঢুঁ মেরে আমাদের আলোচনায় মাথা গলিয়ে দেওয়া।

অথচ আজ দুপুর বেলাতেই আমরা হার মেনে ফিরে এসেছি মুখ চুন করে। শিশির যেন বৃষ্টিতে নীচের ঘরে জল পড়ার সমস্যা মেটাতে ঘনাদার কুঠুরির সামনের ছাদটা তদারক করতে

গেছল। সঙ্গে আমাকেও থাকতে হয়েছিল ব্যাপারটা সরব করবার জন্যে।

ছাদটা তো অনেক জায়গায় দাগরাজি করতে হবে দেখছি!—আমার গলাটা আশা করি রাস্তার ওপারের বাড়িতেও শোনা গেছল।

দাগরাজি!—শিশির তার গলাটা গলি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছিল,—শুধু দাগরাজিতে কী হবে! সমস্ত ছাদ খুঁড়ে নতুন করে পেটাই করতে হবে।

ঘনাদার তাতে বড্ড অসুবিধে হবে না?—আমি তারস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

আকাশে অনেক উঁচুতে একটা চিল নিশ্চিন্ত মনে ভেসে চক্কর দিতে দিতে হঠাৎ ডানা নেড়ে তীরবেগে সরে পড়েছিল, কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে গিয়ে তক্তপোশের ওপর আসীন ও খবরের কাগজে নিমগ্ন ঘনাদার বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা যায় নি।

ছাদের ফাটল দেখবার ছলে শিশির এবার ঘনাদার দরজার কাছে গিয়ে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের জন্যে নতুন সিগারেটের টিনটা খোলবার কসরত করেছিল।

আমাকে ও সেই সঙ্গে পাড়ার পাঁচজনকে শুনিয়ে বলেছিল,—একেবারে তাজা মাল। খুললেই কী রকম শিস্ দেয়, শোনো!

সিগারেটের টিন খোলার শিস্ না হোক, শিশিরের সরব বিজ্ঞাপন সারা বনমালী নস্কর লেনকেই সচকিত করে তুলেছিল, কিন্তু ঘনাদার মুখের সামনের খবরের কাগজটা একটু কাঁপেও নি।

ছাদ মেরামত সম্বন্ধে আরো কিছু আবোল-তাবোল বকে আমাদের নেমেই যেতে হয়েছিল অগত্যা।

ঘনাদার এবারের ধনুকভাঙা পণ আর টলবার নয় বলেই তখন ধরে নিয়েছি।

ছোট্ট এক বাটি তেল এই তিন মাস ধরে এতদূর গড়াবে ভাবতেও পারি নি আমরা কেউ।

হাঁ, সামান্য এক বাটি তেল থেকেই বাহাত্তর নম্বরের ঠাণ্ডা লড়াই এবার শুরু।

তেলটা যে সরষের তা আর বোধহয় বলতে হবে না। তখন তার আকাল সবে দেখা দিয়েছে। একেবারে হা তেল! জো তেল! বলে আর্তনাদ না উঠুক, তেল আনতে অনেকের বাড়িরই কড়া পুড়ে যেতে শুরু করেছে, দোকানের কিউ দেওয়া লম্বা লাইনের কৃপায়।

সে মাসটায় মেসের ম্যানেজারি ছিল গৌরের ঘাড়ে। অতি কষ্টে মাসখানেকের মত তেল কোথা থেকে সে যোগাড় করে এনেছে।

তিন হপ্তা না যেতেই ঠাকুর রামভুজের কাছে তেল বাড়ন্ত শুনে একেবারে খাপ্পা।

ধমক খেয়ে রামভুজ আমতা-আমতা করে জানিয়েছে যে তার কোন কসুর নেই। বড়বাবুকে রোজ এক বাটি করে মাখবার তেল না দিতে হলে সে পুরো মাসটা নিশ্চয়ই চালিয়ে দিতে পারত।

আমরা একটা ফোঁটার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছি, আর বড়বাবু রোজ রোজ বাটি বাটি তেল মাখছেন! বলে দেবে যে মাখবার তেল এখন থেকে নিজেই যেন যোগাড় করেন!

মেজাজ যত গরমই হোক তালে ভুল করবার ছেলে গৌর নয়। দোতলার সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে, কথাগুলো চাপা গলাতেই বলেছে।

তেতালার ঘরে সে আওয়াজ পৌঁছোবার কথা নয়। তবু সেদিন সন্ধ্যে থেকেই ঘনাদা আমাদের ত্যাগ করেছেন। তার সে আত্ম-নির্বাসন পর্বই চলে এসেছে আজ পর্যন্ত।

তারপর হঠাৎ যেন ভেল্‌কিবাজিতে কোথা থেকে কী হয়ে গেল!

কার্য-কারণ সূত্র সন্ধান করতে গেলে গৌরের রেন-কোটটাই মূল বলে ধরতে হয় বোধহয়। গৌরের একটা রেন-কোট যদি না থাকত···

না, তা যদি বলি তা তাহলে রেন-কোটটাই বা কেন, কার্য-কারণ শৃঙ্খল খুঁজতে আরো বহুদূর তো যাওয়া উচিত।

বাঙলাদেশে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল নামে দুটি অতুলনীয়

টীম যদি না থাকত, বছরের পর বছর তাদের রেষারেষির পাল্লায় সারা দেশ যদি উত্তেজনার দোলায় না দুলত, লীগের হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় আগু-পিছু হতে হতে দুই টীম যদি একই পয়েন্টের কোঠায় এসে না দাঁড়াত, চ্যারিটি ম্যাচের সাত রাজার ধন মানিকের মত দুর্লভ টিকিট শিশির ও গৌর দুজনেই যদি বহুজন্মের পুণ্যফলে না পেয়ে যেত, আর বৃষ্টির হুমকি দেওয়া এক বিকেলে দু'জনে দু'টি রেন-কোট নিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে উপস্থিত না হত, তাহলে গৌরের রেন-কোটও হারাত না, আর আমরাও ঘনাদার অভাবের দুঃখ ভুলতে রেন-কোট উদ্ধারের উপায় ভেবেই সন্ধ্যেটা জমাবার চেষ্টা করতাম না।

তবু রেন-কোট দিয়েই শুরু করা যাক।

গৌর সেদিন তার রেন-কোটটা হারিয়ে এসেছিল। হারিয়েছিল মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের চ্যারিটি ম্যাচের খেলা দেখতে গিয়ে। মোহনবাগান এক গোল দিতেই উদ্বাহু হয়ে সে নৃত্য শুরু করেছিল, শিশিরের দিকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রূপ-বাণ হানতে হানতে। ইস্টবেঙ্গল কয়েক মিনিট বাদেই সে গোল শোধ করে দিতেই শিশিরের অসভ্যতায় বিরক্ত হয়ে অন্য জায়গায় সরে বসেছিল। শিশিরের সত্যিই বাড়াবাড়ি। ইস্টবেঙ্গল না হয় কেঁদে ককিয়ে একটা গোল শোধ করেই ফেলেছে। তাতে অমন হাত-পা ছোঁড়বার আর গাঁক গাঁক করে চেঁচাবার কী আছে!

মোহনবাগান তারপর আর একটা গোল দিয়ে ফেলতেই নাচতে নাচতে গৌর শিশিরের কাছেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু শিশিরের মনটা এমন ছোট ভাবতে পারে নি। মোহনবাগান জিতেছে বলে জায়গা ছেড়ে কি না সরে পড়েছে! খুশী না হয় নাই হলি, কিন্তু গৌরের ভালো ভালো শানানো কথাগুলো তো শুনতে পারতিস! সেটুকু খেলোয়াড়ী উদারতা,—যাকে বলে স্পোর্টিং স্পিরিট যদি না থাকে, তাহলে খেলা দেখতে আসা কেন?

এর পর শিশির কোথায় গিয়ে লুকিয়ে বসেছে গৌর খুঁজে বার

নিশ্চয়ই করত। তাই করবেই ঠিক করেছিল। হাজার হোক বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে একটু উপদেশ দেওয়াও তো দরকার। সেই সঙ্গে 'ইস্টবেঙ্গল যে হারবে এ আর এমন বেশী কথা কি!' বলে একটু সান্ত্বনা।

কিন্তু এর মধ্যে মেঘ নেই জল নেই, হঠাৎ বজ্রাঘাত!

ইস্টবেঙ্গল কোথা থেকে ঝপ্ করে আবার একটা গোল দিয়ে বসল!

এ যে অফসাইড গোল সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তর্ক করতে গেলে তো শিশিরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। ধেই-নৃত্য করতে করতে সে যে এই দিকেই এখন আসবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই!

খেলা শেষ হতে তখনও মিনিট কয়েক বাকি। গৌর তবু আগেই চলে এসেছে মাঠ থেকে।

মাঠ থেকে ট্রামের লাইন পর্যন্ত আসতে আসতেই বৃষ্টি।

রেন-কোটটা সম্বন্ধে খেয়াল হয়েছে সেই তখন। কিন্তু তাতে আর লাভ কি!

একেবারে সপসপে হয়ে ভিজে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের দোতালায় আড্ডাঘরে পা দিয়েই শিশিরকে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বলেছে, কী রকম আক্কেল তোর! আমার ওয়াটারপ্রুফটা নিয়ে চলে এলি!

তোর ওয়াটারপ্রুফ!—শিশির তাজ্জব, তোর ওয়াটারপ্রুফ আমি নিতে যাব কেন? আমার কি দুটো ওয়াটারপ্রুফ লাগে?

বাঃ তোর পাশেই তো রাখা ছিল!—গৌরের গলাটা আর তেমন কড়া নয়।

তার পাশে তো তুইও ছিলি!—শিশিরের একটু যেন বাঁকা জবাব,—মোহনবাগান গোল খেতেই গ্যালারির ফাঁকে গলে পড়েছিলি নাকি!

বাহাত্তর নম্বরও খেলার মাঠের মত কাদা হয়ে ওঠবার ভয়ে ওয়াটারপ্রুফ রহস্যের সমাধানে আমাদেরও যোগ দিতে হয়েছে এবার।

ব্যাপারটা কী বুঝে নিয়ে নিজের নিজের মতামত ও পরামর্শ জানিয়েছি।

শিবু দার্শনিক মন্তব্য করেছে,—খেলার মাঠে ওয়াটারপ্রুফ কখনো হারায় না! হারায়, আবার পাওয়া যায়।

কী রকম?—গৌরের বদলে আমরাই অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

কী রকম আবার?—শিবু গম্ভীরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে,—ওই মাঠেই পাওয়া যায় একটু ধৈর্য ধরে থাকলে। রংটা, মাপটা হয়ত মিলবে না, কিন্তু পাওয়া যাবেই।

তার মানে আর কারুর ফেলে যাওয়া ওয়াটারপ্রুফ! তাই আমি নেব?—গৌর জামা নিংড়াতে নিংড়াতে চোখ পাকিয়ে বলেছে।

ওই সব তুচ্ছ আত্মপর-ভেদ খেলার মাঠে নেই।—শিবু যেন বাণী দিয়েছে,—কেউ হারাবে, কেউ পাবে, এই ওখানকার দস্তুর। হারিয়ে এসেও আফসোস করবে না, পেয়ে গেলেও নিতে কোন সংকোচ করবে না। একহিসাবে ওয়াটারপ্রুফ বদলাবদলিরই বাজার। নিজেরটায় অরুচি ধরলে ইচ্ছে করেই কেউ কেউ ফেলে আসে বলে আমার বিশ্বাস। নিজেরটা হারালে পরেরটা নিতে তো আর বিবেকে বাধবে না!

শিবু আরো হয়ত ব্যাখ্যান করত। কিন্তু গৌর তার ভিজে জামাটা শিবুর মাথাতেই নিংড়ে বলেছে,—থাক থাক আর মাথা খাটিয়ে কাজ নেই। যা ফুলকি ছাড়ছে এঞ্জিনই না জ্বলে যায়।

শিবুকে তখনকার মত ঠাণ্ডা করে গৌর নিজের ঘরে গেছে জামাকাপড় ছেড়ে আসতে। ইতিমধ্যে বনোয়ারী ঝাল-মুড়ির গামলা রেখে গেছে মাঝখানের টেবিলে।

তাই চিবোতে চিবোতে চোখে যত জল ঝরেছে, বুদ্ধি তত যেন খুলে গেছে মাথায়।

গৌর ফিরে আসবারও যেন তখন আর তর সইছে না।

সে ঘরে এসে ঢোকবামাত্র তাই আশ্বাস দিলাম,—কোন ভাবনা নেই। রেন-কোট ফেরতই পেয়ে গেছ মনে করতে পারো!

যে ভাবে, কেউ কপাল কুঁচকে, কেউ বা মুখ বাঁকিয়ে হেসে তাকাল, তাতে একটু ক্ষুণ্ণ হবারই কথা।

কিন্তু ভ্রূক্ষেপই করলাম না। আমার মুশকিল-আসানের মোক্ষম দাওয়াই-টা একবার শুনলে মুখের চেহারা যে বদলে যাবে সে বিষয়ে আমার তো সন্দেহ নেই।

শোনবার পর তাই হল! সবাই একেবারে যাকে বলে হতবাক্।

শিবু চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়া করে জিজ্ঞাসা করলে,—কী বললে?

প্রস্তাবটা আর একবার শুনিয়ে দিতে হল একটু বিশদ ব্যাখ্যা সমেত।

এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। শুধু কিছু হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে গেটে গেটে বিলি করা। হ্যাণ্ডবিলে লেখা থাকবে।—

সাবধান! সাবধান!

ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের অবগতির হেতু জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, গত ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান প্রতি-যোগিতার দিনে খেলার মাঠে একটি বর্ষা-ত্রাণ পরিচ্ছদ অনবধানতায় ক্রীড়াভূমির কাষ্ঠাসনে পরিত্যক্ত হইয়াছে। উক্ত পরিচ্ছদের অধিকারী কঠিন চর্মরোগে আক্রান্ত। সুতরাং ভ্রমক্রমে কেহ যেন সেটি ব্যবহার না করেন। করিলে রোগ তদ্দেহে সংক্রামিত হওয়া অবধারিত।

পরিচ্ছদটি পুরাতন সংবাদপত্রে সতর্কভাবে আচ্ছাদিত করিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় বাহকের দ্বারা বা ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া জনহিতৈষণার পরিচয় দিন।

খানিকক্ষণ ঘরে আর টুঁ শব্দ নেই।

শিবুই প্রথম বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে,—হ্যাঁ, এতেই কাজ হবে, নির্ঘাত কাজ হবে।

শিবুর সমর্থনে সন্তুষ্ট হয়ে তার দিকে চেয়ে একটু প্রসন্ন হাসি হাসলাম।

শিশির আমার দিকে বিস্ময়ভরেই বোধ হয় খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললে,—হ্যাঁ, কাজ ঠিক হবে, তবে পুলিস না করপোরেশনের লোক, কারা আসবে তাই ভাবছি।

সুরটা কেমন ভালো লাগল না। একটু সন্দিগ্ধ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম,—পুলিশ কি করপোরেশনের লোক আসবে, মানে?

না।—শিবু আমায় আশ্বাস দিলে,—শিশির ভুল করছে। এলে প্রথমে অ্যাম্বুলেন্সই আসবে।

অ্যাম্বুলেন্স!—আমি বিমূঢ় আর সেই সঙ্গে একটু বিরক্তও,—অ্যাম্বুলেন্স এখানে আসছে কোথা থেকে!

কোথা থেকে আর!—শিশির ব্যাখ্যা করলে,—খোদ স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে।

শিবু ব্যাখ্যাটা বিশদ করলে,—গৌরকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছোঁয়াচে রোগের হাসপাতালে নজরবন্দী করে রাখবার জন্যেই অ্যাম্বুলেন্স আসবে। এরকম একটা সাংঘাতিক রুগীকে তো বাইরে রাখা নিরাপদ নয়।

একটা নয়, দুটো অ্যাম্বুলেন্সই তাহলে আসা উচিত।—গৌরই মন্তব্য করলে,—একটা যদি আমার জন্যে হয়, তাহলে আরেকটা এ ইস্তাহার যাঁর মাথা থেকে বেরুচ্ছে তার জন্যে। সে অ্যাম্বুলেন্স অবশ্য মেন্ট্যাল হসপিট্যাল থেকেই আসবে।

এবারে যে হাসির রোলটা উঠল তাতে যোগ দিতে পারলাম না। সংসারের ওপর আমি তখন বীতশ্রদ্ধ! সত্যিকার গুণের আদর যেখানেই, পরোপকারের নিঃস্বার্থ চেষ্টা যেখানে উপহাসের বিষয়, সে স্থান ত্যাগ করাই উচিত কিনা ভাবছি—এমন সময় একটু যেন হন্তদন্ত হয়েই ঘনাদার প্রবেশ।

বিমূঢ়তার ধাক্কায় হাসির রোল থামতে-না-থামতেই শিশিরের ছেড়ে-ওঠা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে নিজে থেকেই সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন,—কী, হাসি কিসের?

আমার তো বটেই, যারা এতক্ষণ হেসে ঘরের কড়িকাঠ কাঁপাচ্ছিল, তাদেরও মুখের হাঁ আর বুজতে চায় না।

শিশিরই সবার আগে নিজেকে সামলে বললে,—আজ্ঞে হাসিটা কিছু নয়। আসলে আমরা একটা সমস্যা নিয়ে ভাবছি।

কী সমস্যা!—ঘনাদা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন সমস্যা ধরতে নয়, শিশিরের সিগারেটের জন্যে। যথারীতি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনীর মধ্যে সিগারেট স্থাপন করে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিয়ে শিশির বললে, সমস্যা একটা বর্ষাতির।

ও, বর্ষাতির!—বলে ঘনাদার অবজ্ঞাসূচক নাসিকাধ্বনিই আশা করেছিলাম—তার বদলে বেশ উৎসাহ ভরে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, বর্ষাতি একটা সমস্যা বটে। বিশেষ করে যদি ফুটন্ত জলের বৃষ্টি হয়। সেবার সেই হাওয়াই দ্বীপে কিলোইয়া ইকি মানে ছোট কিলোইয়ার আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে ওঠায় যা হয়েছিল!

ঘনাদার হল কি! এ যে মেঘ না চাইতেই জল!

ফুটন্ত বৃষ্টি থেকেই গল্পের বন্যা বয়ে যেত বোধহয়, কিন্তু গৌর নেহাত বেরসিকের মত বাগড়া দিলে।

সে বৃষ্টির কথা হচ্ছে না। আমার বর্ষাতিটা খেলার মাঠে হারিয়েছে···

গৌরকে কথাটা আর শেষ করতে হল না। ঘনাদা 'হারিয়ে'

পর্যন্ত শুনেই বলে উঠলেন,—তা হারিয়ে যাবার কথা যদি বলো একটা বর্ষাতি হারানো কিছুই নয়, সেবার নিউগিনির কাম্বারাম্বা গাঁয়ে পুকপুক মানে কুমির শিকারে বেরিয়েছি···

রেন-কোট হারিয়ে গৌরের আজ মাথার ঠিক নেই বোধহয়। ঘনাদাকে বাধা দেবারই তার যেন বেয়াড়া জেদ চেপে গেছে।

কুমিরের কথা আসছে কোথা থেকে।—প্রায় যেন ধমকেই সে ঘনাদাকে থামিয়ে দিলে.—শুনছেন বর্ষাতিটা ভুলে খেলার মাঠে ফেলে এসেছি। সেটা উদ্ধার করা যায় কিনা তাই সবাই ভাবছি। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন···

গৌরকে আর এগুতে হল না। ঘনাদার যেন কুটি পেলেই আঁকড়ে ধরবার অবস্থা। 'বিজ্ঞাপনের' ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্রায় চোখ কান বুজে—

বিজ্ঞাপন বড় গোলমেলে জিনিস হে! খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন থেকেই বেচুয়ানাল্যাণ্ডে অত বড় একটা চক্রান্ত সেদিন ধরা পড়েছিল।

গৌর এবারও বাদ সাধবার উপক্রম করছিল। দুদিক থেকে দুপায়ে শিবু আর শিশিরের কড়া ঠোক্কর খেয়ে তাকে থামতে হল।

গৌর থামলেও আর এক উপদ্রব আচম্বিতে দেখা দিল আড্ডা-ঘরের দোরগোড়ায়। আমাদের বনোয়ারী! কাঁচুমাচু মুখে সে তার বার্তাটুকু জানাল—

বড়াবাবুকে একজনা নীচে বোলাইছে।

গৌরকে সামলাবার পর এমন ঘাটের কাছে এসে ভরাডুবি হতে আর আমরা দিই! পাছে ঘনাদা এই ফাঁকে ফস্‌কে যান এই ভয়ে বনোয়ারীকে ধমক দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার দরকার হল না।

ঘনাদা একবার বনোয়ারীর দিকে একটু সন্ত্রস্তভাবে চেয়ে নিজেই গল্পের দড়ি ধরে যেন বেপরোয়া ঝুলে পড়লেন।

কী বলছিলাম, বিজ্ঞাপন? হ্যাঁ, বড় অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল জোহান্নেসবার্গের এক কাগজে। জোহান্নেসবার্গ কোথায় জানো তো? দক্ষিণ আফ্রিকায় ট্রান্সভালের সব চেয়ে বড় শহর। শহর গড়ে উঠেছে সোনার খনির কল্যাণে। হীরেও আছে। শহরের দক্ষিণেই যে নীচু পাহাড়ের সার চলে গেছে তা সোনায় ঠাসা বলা যায়। শহরের নামটাও ওই সোনার সন্ধান থেকেই এসেছে। ১৮৮৬তে জোহান্নেস রিস্‌সিক বলে একজন ওলন্দাজ ছিলেন জরিপ বিভাগের কর্তা। তাঁর আমলেই সোনার খোঁজ ওখানে মেলে। তাঁর নামেই তাই শহর বসানো হয়।

মাটিতে যেখানে সোনা সেখানে মানুষের মনে সীসের বিষ। গায়ের চামড়া ধলা না হলে সে দেশের মানুষ জন্তুজানোয়ারেরও অধম বলে গণ্য। ধলাদের রাজত্বে কালা আদমীর মানুষদের মত মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার নেই। তারা শুধু আছে ধলাদের ক্ষেত খামারে গরু বলদের মত খাটতে, খনির তলা থেকে ইঁদুর-ছুঁচোর মত ধলাদের জন্যে সোনা হীরে তুলতে। ধলাদের ছায়া মাড়ালেও কালাদের সাজা পেতে হয়। তাদের শহরের বাইরে ছাগলের খোঁয়াড়ের অধম বস্তিতে থাকার ব্যবস্থা। ধলাদের বাসে-ট্রামে তারা চড়তে পারে না, ধলাদের দোকানে রেস্তোরাঁয় ঢুকতে তো নয়ই। ধলাদের জন্যে আলাদা করে রাখা পার্কের বেঞ্চিতে শুধু হেলান দেওয়ার জন্যে কালা মানুষকে হাজতে যেতে হয়েছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কালাদের ওপর ধলাদের জুলুমের সঠিক খবর আনবার জন্যে এক মার্কিন কাগজের হয়ে তখন সেখানে গিয়েছি। পোর্ট এলিজাবেথ, ডারবান, কিম্বার্লি, প্রিটোরিয়া হয়ে শেষে পৌঁছেছি জোহান্নেসবার্গে। যা দেখবার শোনবার সবই দেখাশোনা হয়েছে, পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে এলেই হয়। এমন সময় সেখানকার কাগজে ওই বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়ল। আফ্রিকানস্‌ ভাষার কাগজ।

এ অঞ্চলের বেশির ভাগ ধলাই মূলে ওলন্দাজ। প্রায় চারশ বছর আগে যারা এসেছিল তাদেরই বংশধর। আফ্রিকানস্ ভাষাও সেই আদি ওলন্দাজী ভাষার অপভ্রংশ।

ছোট্ট বিজ্ঞাপন। খবরের কাগজের লাইন চারেক মাত্র। কিন্তু যেমন অদ্ভুত তার মর্ম, তেমনি কালাদের ওপর অবজ্ঞা আর ঘৃণা মেশান তার ভাষা। বিজ্ঞাপনটা কালাদের পড়বার জন্যে অবশ্য লেখা নয়। পড়বে কে? ওখানকার কালাদের কাগজ-কালির সঙ্গে সম্পর্ক তো শুধু টিপসই দেওয়ায়।

কালা কুলিমজুরদের ঠিকাদারদের উদ্দেশেই বিজ্ঞাপনটা দেওয়া। তাতে লেখা: সাতদিন জল না খেলেও মরে না এমন সুঁটকো চিমসে গোছের একটা কালা নফর চাই। কোনো ঠিকাদার সে রকম কাউকে ধরে আনলে পুরস্কার পাবে।

এ রকম বিজ্ঞাপন দেখে আর ঠাণ্ডা থাকা যায়!

গেলাম ঠিকানা যা দেওয়া ছিল খাস শহরের সেই এলফ্ স্ট্রীটের অফিসে।

পোশাকটা কুলিমজুরের মতই করেছিলাম। যেতে যেতে এ শহরের যা এক বিশ্রী উপদ্রব, সেই সাদা ধূলোর ঝড়ে পড়ে চেহারা আরো খোলতাই হয়ে গেল। জোহান্নেসবার্গের চারধারে সোনার খনির গুঁড়ো করা পাথর থেকেই এই ধূলোর পাহাড় জমে থাকে। ঝড়ের সময় তারই ধূলোয় সারা শহর অন্ধকার করে দেয়।

জোহান্নেসবার্গ শহরের রাস্তাগুলো যেন জ্যামিতি ধরে পাতা। পুব থেকে পশ্চিম, আর উত্তর থেকে দক্ষিণের সোজা সোজা রাস্তাগুলো পরস্পরকে চৌকোণা করে কেটে গিয়েছে।

অফিসটা একটা ছোটখাট তামাকের কোম্পানির। ঠিক এলফ্ স্ট্রীটে নয়, তার গা থেকে বার হওয়া একটা গলির মধ্যে।

নিজে আমাদের মত কালা আদমীর অবশ্য আসল অফিসে ঢোকবার

হুকুম নেই। অফিসের পেছনের গোডাউনের ভেতর গিয়ে দাঁড়াতে হল।

বিজ্ঞাপন চার লাইনের হলেও উমেদার খুব কম জোটে নি দেখলাম। ভরসার কথা এই যে বিজ্ঞাপনের ফরমাশের সঙ্গে তাদের প্রায় কারুরই মিল নেই। বেশির ভাগই শক্তসমর্থ চেহারা। রোগা পটকা যা আছে সবই বুড়োটে। সঙ্গে ধলা ঠিকাদার। পুরস্কারের লোভেই কপাল ঠুকে যা হাতের কাছে পেয়েছে ঝেঁটিয়ে এনেছে।

আমার অনুমান ভুল নয়। এক এক করে ডাক পড়ে আর ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই বাতিল হয়ে বেরিয়ে আসে।

দেখতে দেখতে আমার পালা এসে গেল।

পাহারাদার গোছের যে জোয়ান লোকটা সবাইকে ডাক দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমার দিকে এবার সে ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে,—এই কালা ভূত! তোর ঠিকাদার কই? কার সঙ্গে এসেছিস?

আফ্রিকানস্ যেন বুঝি না এই ভাব দেখিয়ে হাঁ করে চেয়ে রইলাম। লোকটা আবার ভাঙা-ভাঙা সোয়াহিলিতে প্রশ্ন করায় যেন ভয়ে ভয়ে বললাম,—আজ্ঞে, একলাই এসেছি।

একলা এসেছিস!—পাহারাদারের গলার আওয়াজে আর মুখের চেহারায় মনে হল আমায় নিয়ে যাবে, না বুটের ঠোক্কর দিয়ে বিদেয় করবে ঠিক করতে পারছে না।

শেষ পর্যন্ত কী ভেবে ব্যাজার মুখে বললে,—আয় তবু! আমার চেয়ে কর্তার গোদাপায়ের লাথির জোর বেশি।

গোডাউনের একধারে কাঠের পার্টিশন দেওয়া একটা মাঝারি মাপের ঘর। তারই ভেতর হাতের খাটো লাঠিটা দিয়ে পাহারাদার আমায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে।

ভেতরে ঢুকে যে মূর্তিটিকে মোটা একটা চুরুট মুখে বেশ অস্থির-ভাবে পায়চারি করতে দেখলাম, তার জুড়ি পাওয়া ভার।

দেখলে সম্ভ্রম হওয়াই উচিত। আমাদের কিঙ্কড় সিং পালোয়ানের রঙটা যদি ধবধবে হত আর চুলগুলো হত কোঁকড়া, আর প্রায় গনগনে আগুনের মত লাল, তাহলে খানিকটা বোধহয় মিল পাওয়া যেত।

পাহারাদার আমার পেছনে এসে ঘরে ঢুকেছিল। সসম্মানে এবার সে জানালে,—কেলেটা একলাই এসেছে বলছে, হের ফিংক। চেহারাটা চিমসে দেখে নিয়ে এলাম।

মুখে চুরুট রেখেই হের ফিংক মেঘগর্জনের মত আওয়াজে বললেন,—ছুঁচোটাকে ধূলোর গাদা খুঁড়ে এনেছ নাকি? ঘরটা তো নোংরা করে দিলে!

আমার দিকে ফিরে হের ফিংক তারপর সোয়াহিলিতে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করলে,—সঙ্গে ঠিকাদার নেই কেন?

ঠিকাদার কোথায় পাব বোয়ানা!—মাটিতে যেন মিশিয়ে বললাম,—সবে তো কাল কালাহারি পেরিয়ে কাজের খোঁজে শহরে এসেছি।

কালাহারি পেরিয়ে এসেছিস!—ফিংক মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে এবার একটু আগ্রহভরেই আমায় লক্ষ্য করে বললে,—আসছিস কোথা থেকে?

তা কি জানি বোয়ানা! সেখান থেকে আসতে অনেকগুলো সূর্যি আর অনেকগুলো চাঁদ আকাশে ঘুরে যায়। পাহাড় জঙ্গল ফুরিয়ে গিয়ে চারদিকে লাল কাঁকর আর বালি ধুধু করে·····

থাম! বলে ধমকে আমার ঠিকানা জানবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে ফিংক এবার জিজ্ঞাসা করলে,—সবে তো কাল এসেছিস, ঠিকাদারও কাউকে জানিস না। তবে এখানকার কাজের খবর পেলি কেমন করে? তুই পড়তে জানিস?

ইচ্ছে করেই বললাম,—হাঁ বোয়ানা।

জবাব শুনে ফিংকের মুখখানাই প্রথমে হাঁ। তারপর যেন নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল,—পড়তে জানিস তুই?

খুব জানি বোয়ানা!—যেন সবিনয়ে জানালাম,—মাটিতে থাবার দাগ পড়ে বলে দিতে পারি সিম্বাটা মদ্দা না মাদী, বুড়ো না জোয়ান, পেট ভরে খেয়েছে না খাবার খুঁজছে ··

চুপ! চুপ।—ফিংক বিরক্ত হয়ে কাছের টেবিলে রাখা খবরের কাগজটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—ওই রকম কাগজ পড়তে পারিস?

কাগজ!—আমি যেন হতভম্ব,—কাগজ পেলে তো আমরা পোড়াই বোয়ানা!

আচ্ছা! আচ্ছা বুঝেছি! ফিংক এবার তার আসল প্রশ্নে ফিরে এল,—এ কাজের খবর পেলি তাহলে কোথায়?

ওই হেরেরা-দের বস্তিতে, বোয়ানা! সরল মুখ করে বললাম, —এক ঠিকাদার কজনকে ডেকে খোঁজ নিচ্ছিল তাই শুনেই চলে এলাম।

হুঁ!—ফিংক চুরুটে টান দিয়ে কী যেন ভেবে নিলে। তারপর আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—কালাহারির মরুভূমি পার হয়ে এসিছিস বলছিস?

হাঁ বোয়ানা! কালাহারি পার না হলে এখানে আসব কী করে?

কদিন লেগেছে পার হতে?

তা তো বলতে পারব না বোয়ানা। তবে কালাহারিতে পা দেবার আগে গোঁফদাড়ি কামিয়ে এসেছিলাম, এখানে পৌঁছে মুখে চার আঙুল জঙ্গল হয়ে গেছল। এখানকার নাপিতরা সে জঙ্গল· ····

আচ্ছা! আচ্ছা বুঝেছি।—বলে তাড়াতাড়ি আমায় থামিয়ে ফিংক বললে,—কালাহারি যে পার হলি, তো জল পেয়েছিলি কোথায়?

জল!—আমি যেন অবাক্!

হ্যাঁ, জল! খাবার জল! তার কী করেছিলি?

কী আবার করব বোয়ানা। খাই নি।

জল খাস নি!—ফিংক আমায় বিশ্বাস করবে, না মিথ্যুক বলে বুটের ঠোক্কর দেবে, যেন ঠিক করতে পারছে না।

বললাম,—জল তো আমার তেমন লাগে না, বোয়ানা। চাঁদ ক্ষইতে ক্ষইতে যখন একেবারে মুছে যায়, তখন একবার খাই আর বাড়তে বাড়তে যখন পুরো থালা হয়ে ওঠে তখন একবার।

ভুরু কুঁচকে আমার দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ফিংক বললে,—ঠিক আছে। তোর কথা সত্যি কি মিথ্যে হাতেনাতেই প্রমাণ হবে! শোন্, আমার সঙ্গে ওই কালাহারিতেই তোকে যেতে হবে। প্রথমে আমার সঙ্গে যাবি মোটরে, তারপর এক জায়গায় তোকে ছেড়ে দেব। তোকে একলা গিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। কতদিন যে জল পাবি না খাবার পাবি না তার কিছু ঠিক নেই। তা তুইতো জল খাস একবার পূর্ণিমায় আর একবার অমাবস্যায়। তোর আর ভাবনা কি!

না সে ভাবনা নেই বোয়ানা। কিন্তু কাজটা কি যদি বলতেন?

এদিক ওদিক চেয়ে পাহারাদারকে পর্যন্ত চোখের ইঙ্গিতে ঘর থেকে বার করে দিয়ে ফিংক কাজটার কথা বলতে গিয়েও কী ভেবে আর বললে না। শুধু বললে, কী কাজ তা এখন শুনে কী হবে! কালাহারিতে গিয়েই বলব।

তা কী করে হয় বোয়ানা! ভয়ে ভয়ে যেন নিবেদন করলাম, কাজটা না জেনে কী করে আপনার সঙ্গে যাই! সে পারব না।

পারবি না মানে!—ফিংকের আসল মূর্তি এবারই পুরোপুরি দেখা গেল। একটি বিরাশি সিক্কার চড় আমার গালে কসিয়ে হাতটা আবার রুমাল বার করে মুছতে মুছতে বললে,—নচ্ছার কালা নেংটি। আমার মুখের ওপর বলিস কিনা পারব না! ঘাড় যদি আর বঁকিয়েছিস তো দুমড়ে শুধু সিধে করব না, সোজা গারদে চালান করে দেব ট্যাক্স রসিদ নেই বলে। আছে তোর ট্যাক্স রসিদ? আছে পাস?

চড় খেয়ে একটা ডিগবাজি মেরে যেখানে পড়েছিলাম সেখান

থেকে যেন কাঁদো-কাঁদো মুখে গালে হাত বোলাতে বোলাতে বললাম,—না বোয়ানা!

তবে!—হাত-মোছা রুমালটা ঘরের কোণে ফেলে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ফিংক বললে, ট্যাক্স রসিদ আর পাস ছাড়া এ শহরের রাস্তায় তোর মত কালা ছুঁচোর হাঁটবার পর্যন্ত হুকুম নেই, তা জানিস না!

কথাটা সত্যি। দক্ষিণ আফ্রিকায় ধলাদের শয়তানী রাজত্বে আঠারো বছর বয়স হলেই কালাদের ওপর ট্যাক্স ধরা হয়। সে ট্যাক্স দেবার রসিদ আর পাস না নিয়ে শহরে ঘুরলে ধরা পড়লেই কয়েদ।

ফিংক এবার পাহারাদারকে ডেকে বললে,—আর যে কটা আছে, সব বিদেয় করে দাও। আর এ হতভাগাকে বেঁধে রেখে দাও এই ঘরে তালা দিয়ে। কিছুতে যেন পালাতে না পারে। আজ রাত্রেই ওকে নিয়ে রওনা হব!

আমার দিকে ফিরে তারপর সোয়াহিলিতে বললে,—কী রে! আর ট্যাঁ ফু করবি?

ভয়ে যেন সিঁটিয়ে গিয়ে বললাম,—না বোয়ানা। এখন থেকে আমি আপনার জুতোর সুকতলা!

জুতোর সুকতলা হয়েই সে রাত্রে ফিংকের সঙ্গে রওনা হলাম তার জীপ গাড়িতে।

ফিংকের আসল মতলব যে শয়তানী গোছের কিছু তা তার রওনা হবার ব্যাপারের গোপনীয়তা থেকেই বোঝা গেল। আমায় ছাড়া আর একটা লোককেও সে সঙ্গে নেয় নি। নিজে সামনে বসে জীপ চালাচ্ছে, পেছনে একরাশ খাবারদাবারের বাক্স আর জলভরা ব্যাগের মাঝখানে আমি কোনরকমে বসে আছি। খাবার আর জলের জায়গা ছাড়া একটা জাল দেওয়া সিন্দুক গোছের বাক্সও আছে সেখানে। সেটা সম্পূর্ণ খালি বলেই রহস্যজনক।

জোহান্নেসবার্গ ছাড়িয়ে দুদিন দুরাত কালাহারির মরুর ভেতর

দিয়ে যাবার পর সে বাক্সের রহস্যটা পরিষ্কার হল। সেই সঙ্গে আমায় কী কাজের জন্যে আনা, তাও।

এতক্ষণ পর্যন্ত কালাহারির কুরুমান নদী ধরেই আমরা এসেছি। কালাহারির নদী মানে শুকনো খাত মাত্র। তাতে জলের বাষ্পও নেই। কালাহারির আকাশে কখনো কখনো অবশ্য মেঘের ঘটা দেখা যায়, বৃষ্টি যে পড়ে না কখনো তাও নয়, কিন্তু সে ছিটেফোঁটা পড়তে না পড়তেই যায় মিলিয়ে। তবে সত্তর বছর আগে একবার এই কুরুমান নদীতে নাকি অবিশ্বাস্য রকমের বৃষ্টিতে বান ডেকেছিল বলে গল্প আছে।

কুরুমানের এখনকার চেহারা দেখে সে গল্পে বিশ্বাস করা শক্ত। পৃথিবীর পুরনো ঘায়ের দাগের মত শুকনো মরা খাত যেন সৃষ্টির আদিকাল থেকে পড়ে আছে। এখানে সেখানে একটা দুটো উট-কাঁটার নীচু ঝোপ ছাড়া কোথাও প্রাণের লক্ষণ নেই।

তবু কালাহারির মত মরুতে এই ধরনের মরা নদী দিয়ে যতদূর পারা যায় যাওয়াই সুবিধের।

এখানে তবু একটা চেনবার মত রাস্তা পাওয়া যায়। এর বাইরে মরুভূমি তো দিক্‌চিহ্নহীন অসীমতা। যেদিকে চাও শুধু ছোট বড় বালিয়াড়ি। মাঝে মাঝে দু' একটা বেঁটে বাবলা জাতের শক্ত কাঁটা-গাছ। কোথায় যে আছি তা জানবার উপায় নেই। সব দিকই এক রকম।

যতদূর পারা যায় কুরুমান নদীর শুকনো খাত দিয়ে এসে উইতদ্রায়াই বলে একটা জায়গায় আমরা আবার আসল মরুতে উঠলাম। ফিংক অবশ্য জায়গাটার পরিচয় কিছু জানত না।

এ পর্যন্ত এটা-ওটা হুকুম করা আর যখন তখন গালাগাল দেওয়া ছাড়া ফিংক আমার সঙ্গে কথাই বলে নি। খাবার যা সঙ্গে এনেছি তা থেকে দুবেলা গাণ্ডেপিণ্ডে খেয়েছে আর আমায় প্রায় ছোবড়া চুষতেই দিয়েছে বলা যায় হেলাফেলায়।

জুতোর সুকতলা হয়ে তবু সবই সহ্য করেছি শুধু তার গোপন শয়তানী মতলবটুকু জানবার জন্যে।

কুরুমান নদীর খাত ছেড়ে ওঠবার পর তাকে বেশ একটু ভাবিত হয়ে এদিক-ওদিক দূরবীন চোখে দিয়ে চাইতে দেখে বুঝলাম জায়গাটা সে ঠিক ঠাহর করতে পারছে না।

যেন অত্যন্ত কাঁচুমাচু হয়ে বললাম,—যদি ভরসা দেন তো একটা কথা বলি বোয়ানা।

কী কথা?—চোখ থেকে দূরবীনটা নামিয়ে ফিংক খিঁচিয়ে উঠল।

এজায়গাটা আমি চিনি বোয়ানা। এটার নাম ছিল উইতদ্রায়াই।

তুই কেমন করে জানলি?—ফিংক বেশ সন্দিগ্ধ।

আমার ঠাকুরদাদার কাছে শোনা বোয়ানা। এখানে অনেক অনেক আগে একটা উটের কাফিলার সরাই ছিল। মরুভূমি পার হবার পথে জিরিয়ে নিতে এখানে থামত।

বটে! তোর ঠাকুরদা কি উট ছিল নাকি, সে কাফিলায়? তাই জন্যেই বুঝি জল না খেলে তোর চলে?

নিজের নীচ রসিকতায় ফিংকের সে কি বিশ্রী হাসি!

অম্লান বদনে সব হজম করে চুপ করে রইলাম। ফিংক দূরবীনটা আবার চোখে দিয়ে এদিক-ওদিক দেখে বললে,—হ্যাঁ, উটের চোখে তুই ঠিকই চিনেছিস। এখন এখান থেকে তোকে একলা কাজ হাসিল করতে যেতে হবে। ভাল করে মন দিয়ে শুনে নে।

মনে মনে বললাম, তোমার এই কাজটা কী জানবার জন্যেই জুতোর সুকতলা হয়ে এতদূর এসেছি, আর মন দিয়ে শুনব না!

মুখে বললাম,—বলুন বোয়ানা!

শোন্, এখান থেকে পাঁচদিনের হাঁটাপথে কাট্‌মানসুফ-এ পৌঁছোবি। কাট্‌মানসুফ-এ কী আছে জানিস্?

কাট্‌মানসুফ নামটা শুনেই ফিংকের শয়তানি মতলবটা আঁচ করে মনে মনে চমকে উঠেছিলাম। বাইরে সেটা প্রকাশ না করে

বললাম,—কী আর থাকবে বোয়ানা! ও অঞ্চলে সোনাদানা কি হীরে নেই বলেই শুনেছি।

ফিংক দাঁত বার করে হেসে বললে,—ঠিকই শুনেছিস। সোনা-দানা কি হীরের জন্যে তোকে পাঠাচ্ছি না। তোকে ওখান থেকে আনতে হবে .....

এক শিশি ডিউটেরিয়াম, মানে ভারী জল!—ঘনাদার আগেই ফোড়ন কেটে বসল শিবু!

না না, ইউরেনিয়াম যাতে থাকে সেই পিচব্লেণ্ড খানিকটা।—আমিই বা কম যাই কেন!

উঁহুঃ!—শিশির টেক্কা দিতে চাইলে,—সেই যে নিরুদ্দেশ বৈজ্ঞানিক ওখানে লুকিয়ে থেকে ক্লোরোফিল তৈরী করছে, তার যুগান্তরকারী ফরমূলা!

রেন-কোট হারাবার বদমেজাজ গৌরের এখনো পুরো ঠাণ্ডা হয় নি। প্রায় যজ্ঞি নষ্ট করে সে হঠাৎ বলে বসল—ঘোড়ার ডিম!

এর পর ঘনাদার মুখ আর সাঁড়াশি দিয়েও খোলা যাবে! সভয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমরা সামলাবার হতাশ চেষ্টা করতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম!

কথাটা যেন কানেই যায় নি এমন ভাবে একবার শুধু বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে ঘনাদা নিজে থেকেই বললেন,—না, ফিংক বললে, আনতে হবে দুটো ভেড়ার ছানা!

ভেড়ার ছানা!—আমরা সবাই একেবারে পপাত ধরণীতলে! এত পেল্লয় পাহাড় পর্বত গোছের ভনিতার পর নেংটি ইঁদুর!

হ্যাঁ, স্রেফ দুটো ভেড়ার ছানা!—ঘনাদা আমাদের মুখগুলোর ওপর চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে বলে চললেন,—ওই হল ফিংকের ফরমাশ! হাবাবোকা সেজে বললাম,—কিন্তু ভেড়ার ছানা যদি ওরা না দেয়! শুনেছি ওখানে নাকি বড্ড কড়াকড়ি! ভেড়া তো ভেড়া, তার দুটো লোম ছিঁড়েও কারুর নিয়ে যাবার

উপায় নেই। বাইরের কাউকে ভেড়ার পালের ত্রিসীমানায় যেতে দেয় না।

তা নয় তো কি তোকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে কারাকুল ভেড়া ভেট দেবে হতভাগা!—ফিংক খিঁচিয়ে উঠল.—তোকে দুটো কারাকুল ভেড়ার ছানা যেমন করে হোক চুরি করে আনতে হবে এখানে! কালাহারি মরুভূমির ভেতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে যাবি আর তক্কে তক্কে থেকে ভেড়ার পাল যেখানে চরায় সেখান থেকে দুটো বেশ তাগড়া ছানা চুরি করে এই মরুভূমির ভেতর দিয়ে পালিয়ে আসবি।

কাঁদোকাঁদো মুখ করে যেন মিনতি করে বললাম,—কিন্তু টের পেলে যে ওদের নেকড়ের মত সব কুকুর লেলিয়ে দেবে, বোয়ানা, নয়ত গুলি করে মারবে। না বোয়ানা, আমায় বরং অন্য কাজ দিন। আমি আপনাকে এক আজব পাহাড়ে নিয়ে যেতে পারি, বোয়ানা। নাম তার ব্রাকোরোট্জ্। এককালে তার মুখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুত। এখন নিবে গেছে।

ফিংক বেশ একটু অবাক্ হয়ে সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে বললে,—ব্রাকোরোট্জ্ আগ্নেয়গিরির নাম তুই জানলি কি করে!

ওই আমার সেই ঠাকুরদাদার কাছে, বোয়ানা। তিনিই আমায় হদিস দিয়ে গেছেন। সে পাহাড় যেখানে হাঁ করে আছে তার কাছে এমন জায়গা আপনাকে দেখাতে পারি যা খুঁড়তে না খুঁড়তে লাল নীল সবুজ ঝিলিক দেওয়া সব নুড়ি আপনাকে চমকে দেবে!

তার মানে চুনি পান্না নীলা!—শিবুই চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করলে,—সত্যি সত্যি ওসব পাওয়া যায় এমন জায়গা আপনি জানেন?

তা জানি বই কি।—ঘনাদা মূর্তিমান বিনয় হয়ে বললেন,—ইংরেজীতে যাদের নাম অ্যামেথিস্ট, ওপ্যাল, গার্নেট, টোপাজ্ বলে,

সে-সব পাথরেরও সেখানে ছড়াছড়ি। সে যাই হোক, আমার কথায় একবার একটু দোনামোনা হলেও ফিংক টলল না। ধমক দিয়ে বললে,—থাম কালা ছুঁচো, তোকে আর লোভ দেখাতে হবে না! তোর ঠাকুরদার ভরসায় বুনো হাঁসের পেছনে আমি ছুটে মরি আর কি! আর তোর কথা যদি সত্যিই হয়, তবু চুনি পান্না তো একবার বেচলেই ফুরিয়ে গেল। তার তো আর ছানাপোনা হয় না। আর এই কারাকুল ভেড়ার জোড়া পাওয়া মানে অফুরন্ত টাকার গাছ পোঁতা। যত দিন যাবে তত হবে তার বাড় আর ফলন।

তা বলে চুনি পান্নার খনির কাছে ভেড়া!—ঘনাদার কথার মাঝখানে শিবুর মুখ ফসকেই বুঝি বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, খনিও যার কাছে লাগে না এমন ভেড়া—ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্লভ আর দামী ভেড়া হল পারস্যের। কারাকুল ভেড়া তার চেয়ে কম যায় না। একটা ভেড়ার দামই অন্ততঃ পনরো হাজার টাকা। কিন্তু সে ভেড়া বিক্রি হয় না। একজোড়া ভেড়ার একপাল হয়ে উঠতে ক'টা বছর আর লাগে! কারাকুল ভেড়ার ছানার পশমী ছাল কিনতে দুনিয়ার শৌখিন ধনকুবেররা পয়সার পরোয়া করে না। একশ বছরেরও আগে পারস্য থেকেই সবচেয়ে সরেস ক' জোড়া ভেড়া কালাহারি মরুর সীমান্তে আমদানি করা হয়। পালকদের যত্নে আর চেষ্টায় সেই ভেড়ার বংশ আজ পারস্যের সঙ্গেই পাল্লা দিচ্ছে। এ ভেড়ার জাতের ওপর লোভ অনেকের। কিন্তু আইন করে কারাকুল ভেড়া চালান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মালিকরা মূর্তিমান যম হয়ে তাদের ভেড়ার পাল পাহারা দেয়। দেবে না-ই বা কেন? দুটো ভেড়া সেখান থেকে সরাতে পারলেই কাম ফতে। ফিংক সেই শয়তানি মতলব নিয়েই এই কালাহারি মরুর বিপদ অগ্রাহ্য করে এখানে এসেছে। আসল কাজটা অবশ্য আমার মত কাউকে দিয়েই হাসিল না করালে তার নয়। ছায়ার মত নিঃশব্দে লুকিয়ে সে মুল্লুকের মজবুত তারের বেড়া দিয়ে

গলে যাবার জন্যে পাতলা ছিপছিপে হওয়া চাই। মরুভূমির দিকটাতেই তেমন ভয়ের কিছু নেই বলে পাহারা একটু আলগা। কিন্তু সেখান দিয়ে ঢোকা তো যার তার কর্ম নয়। জল আর খাবার দুইএর কিছুই অন্ততঃ পাঁচদিনের পথে মিলবে না। সে-সব লটবহর সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এমন কাউকে তাই চাই উটের মত অন্ততঃ জল ছাড়াই বেশ কিছুদিন যে টিকে থাকতে পারে। ফিংক এই সব ভেবেই ওরকম বিজ্ঞাপন দিয়েছিল।

আমায় এবার সে সোজা হুকুম দিলে, যেমন করে হোক কীট্‌মানসুফ-এ গিয়ে ভেড়ার ছানাব জোড়া চুরি করে আনতে।

যেন নিরুপায় হয়ে বললাম,—কিছু খাবার জল তাহলে সঙ্গে দিন।

শুনেই ফিংক খাপ্‌পা—আরও কিছু চাই না? এই জীপ গাড়ীটাও! সেই জন্যেই সব নিয়ে এসেছি যে! হতভাগা কালা ছুঁচো! যেমন আছিস ঠিক তেমনিভাবে এখ্‌খুনি রওনা হবি। তোর না একবার পূর্ণিমা আর একবার অমাবস্যায় জল খেলেই চলে। আমায় ধাপ্পা দিয়েছিলি তাহলে?

ধাপ্পা কেন দেব, বোয়ানা।—কাকুতি করে বললাম,—কিন্তু এ কাজ হাসিল করতে পুরো চাঁদ থেকে পুরো আঁধারের বেশিও তো লাগতে পারে! আপনার ত অনেক আছে, শুধু একটা জলের বোতল যদি দিতেন।

একটি ফোঁটাও না!—ফিংক গর্জে উঠল,—তোর যদি বেশী দিন লাগে তো আমি এখানে আঙুল চুষব নাকি! তুই ওখানে গুলি খেয়ে মরলে আমায় ফিরে যেতে হবে না! তবে ওদিক দিয়ে পালাবার মতলব যদি করে থাকিস, তাহলে মরেছিস জানবি। এখানে আসার আগে আশেপাশে সব রাজ্যে তোর ওই সুঁটকো চেহারার বর্ণনা দিয়ে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। খবর পাঠিয়েছি আমার টাকা চুরি করে পালিয়েছিস বলে। পালালে ধরা তুই পড়বিই।

আর পড়লেই অন্ততঃ সাতটি বছর জেলের ঘানি টানবি। বেঁচে থাকলে তাই তোকে ফিরতেই হবে এখানে।

ফিংক যে কতবড় শয়তান আগে বুঝিনি এমন নয়। তার আসল চেহারাটা এবার আরো একটু স্পষ্ট হল মাত্র।

ঘনাদা দম নেবার জন্যে একটু থামতেই আবার আমাদের মূর্তিমান বনোয়ারী দরজায় এসে খাড়া। ভয়ে ভয়ে জানালে,—

নীচে উ বাবু বড়া গোলমাল লাগাইসে!

বনোয়ারীকে কিছু বলব কি, ঘনাদা তার আগেই শুরু করে দিয়েছেন:

যেমন ছিলাম তেমনিই অগত্যা রওনা হয়ে পড়লাম। ফিরেও এলাম দিন দশেকের ভেতরই এক রাত্রে। সঙ্গে দুটো কারাকুল ভেড়ার ছানা।

ফিংক তো মহাখুশী। জাল দেওয়া যে সিন্দুকের মত বাক্সটা এনেছিল তার ভেতর ভেড়ার ছানা দুটোকে আমায় যত্ন করে ভরে রাখতে বলে কাজ হাসিল হওয়ার দরুন নিজেই ফুর্তি করতে বসে গেল।

কাজ সেরে তার কাছে যখন গেলাম, তখন বাইরে বালির ওপরই শতরঞ্জি পেতে কাছেই উট-কাঁটা ঝোপ গাছের আগুন জ্বেলে সে নবাবী মেজাজে চব্যচোষ্য খাবার সাজিয়ে বসেছে। কতদিন এ কাজে লাগবে না জানায়, ফুরিয়ে যাবার ভয়ে এতদিন জল আর খাবার যথাসম্ভব যা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, আজ তার সদ্ব্যবহার করছে নির্ভাবনায়।

কালাহারিতে অন্য মরুভূমির মতই দিনের বেলা যেমন গরম, রাত্রে তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা। দিনের বেলা থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল বলে সে রাত্রে ঠাণ্ডা একটু বেশী।

আগুনের কাছাকাছি গিয়ে বসে বললাম,—আমার কাজ তো শেষ বোয়ানা। এবার আমার বক্‌শিশ।

হুঁ, তোর বক্‌শিশটাই শুধু বাকি ;—খাবার চিবোতে চিবোতে পাশে রাখা রিভলভারটা হাতে করে নিয়ে ফিংক বললে,—তোর জন্যে খুব ভালো বক্‌শিশই ভেবে রেখেছি।

যেন ধৈর্য ধরতে পারছি না এমনভাবে জিজ্ঞাসা করলাম,—কী বোয়ানা ?

তোর জন্যে এখানে বালির তলায় যদি একটা ছোট্ট ঘর বানিয়ে দিই, কেমন হয় ? অনেক ঘোরাফেরা করেছিস, খুব ধকল হয়েছে তোর! একটু বিশ্রাম দরকার। সে ঘরে থাকলে আর তোকে নড়তে চড়তে হবে না। চিরকাল শুয়ে থাকতে পারবি। আমারও একটু সুবিধে হবে। তুই-ই এ ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষী। তোর মুখ থেকে কথা বার হবার ভাবনা আর থাকবে না।

একেবারে গদগদ হয়ে বললাম,—সে তো খুব ভাল কথা, বোয়ানা। শুনেই আমার আড়মোড়া ভাঙতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সুবিধের সঙ্গে একটু অসুবিধে যে আপনার হবে।

আমার অসুবিধে!—রিভলভারটা তুলে আমার দিকে তাক করে ফিংক বিশ্রীভাবে হেসে বললে, আমার অসুবিধে তো শুধু মরুভূমিটা একলা পার হওয়া। সঙ্গে আমার কম্পাস আছে। তাই দেখে জীপের মুখও আমি ঘুরিয়ে রেখেছি। এখন শুধু নাক বরাবর চালিয়ে গেলেই দক্ষিণ রোডেশিয়ায় দিন দশেকের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোব। সেখানে একবার পৌঁছোলে আর আমায় পায় কে!

কিন্তু সেখানে পৌঁছোনো তো দরকার!—আমি যেন ফিংকের জন্যেই ভাবিত,—কম সময় তো নয়, দিন দশেক। দিন দশেক জল না খেয়ে কি আপনার চলবে ?

জল না খাব কেন ?—ফিংক হায়নার মত হেসে উঠল,—এখনো কম সে কম এক মাসের জল আমার গাড়িতে মজুদ।

না, বোয়ানা!—অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালাম,—ভেড়ার ছানা

ভরতে গিয়ে দেখি সব জলের জায়গাগুলোই খালি। হয় ফুটা হয়ে পড়ে গেছে, নয় কেউ ফেলে দিয়েছে!

তুই! তুই জল যদি ফেলে থাকিস্,—ফিংক রিভলভার হাতে লাফিয়ে উঠল খ্যাপার মতই,—তাহলে এখুনি তোকে আমি···

গুলি করবেন।—আমি ফিংকের কথাটাই পূরণ করে দিলাম,—কিন্তু তাহলে বিপদ তো আরো বাড়বে বোয়ানা। এই কালাহারিতে জলের সন্ধান যদি কেউ দিতে পারে তো আমি। জলের লুকোনো ঝরনা যদি না-ও মেলে তাহলেও এ মরুভূমিতে যা দিয়ে তেষ্টা মেটানো যায় সেই বুনো তরমুজ ত্সোমা কোথায় পাওয়া যায় আমিই আপনাকে দেখাতে পারি। আমায় গুলি করলে আপনার ফেরবার কোন আশাই তো নেই।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করলেও অবস্থাটা বুঝে নিজেকে সামলে ফিংক বললে,—বেশ গুলি তোকে করব না, তাহলে কী তুই চাস?

আমি কি চাইব বোয়ানা, একটু বক্শিশ চাই!

কী বক্শিশ?—ফিংক উদার হয়ে উঠল,—আমায় রোডেশিয়ায় ভালোয় ভালোয় পৌঁছে দিতে পারলে তোকে এত টাকা দেব যে সারাজীবন আর তোকে খেটে খেতে হবে না। নিজের মুল্লুকে গিয়ে মোড়ল হয়ে বসবি।

আপনি মহানুভব!—যেন কৃতার্থ হয়ে বললাম,—কিন্তু আপনার বড় ভুলো মন, বোয়ানা। ওখানে পৌঁছে হয়ত হাত চুলকে উঠে গুলি করে বসবেন। আমি তাই বক্শিশটা চাই নগদ।

কী বক্শিশ, বল্!—ফিংক একেবারে কল্পতরু!

এমন কিছু নয়,—আমি একটু যেন লজ্জা-লজ্জা ভাব করে নিবেদন করলাম,—জোহান্নেসবার্গে আমাকে যা দিয়ে ধন্য করেছিলেন, তাই শুধু আপনাকে ফেরত দেবার হুকুম।

কী দিয়েছিলাম তোকে সেখানে?—ফিংক বেশ একটু ভ্যাবাচাকা।

শুধু গালে একটা চড়, বোয়ানা!—আমার গলা মিছরির মত।

ফিংক যেরকম তিড়বিড়িয়ে উঠল তাতে রিভলভারটা বেকায়দাতেই ছুটে যেতে পারত। উট-কাঁটা গাছের একটা জ্বলন্ত ডাল তার দিকে ছুঁড়ে আগেই তাই আমি একটু সরে গেছি। সেখান থেকে শোয়া-ঝাঁপ দিয়ে তার পা-দুটো ধরে মাটিতে তাকে আছড়ে ফেলে রিভলভারটা কেড়ে নিলাম। তারপর বাঁ-হাতে জামার কলার ধরে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে যেন লজ্জিত হয়ে বললাম,—একটা বড় ভুল হয়ে গেছে বোয়ানা, একটা নয় দুটো চড়ই দু'গালে আপনার দিতে হবে।

উট-কাঁটার আগুন তখন ফিংকের চোখেই যেন জ্বলছে। শুধু আমার হাতের রিভলভারটার দিকে চেয়ে সে নাক দিয়ে এঞ্জিনের স্টীম ছাড়তে ছাড়তে চুপ করে রইল।

বললাম,—একটা চড় দিতে হবে বোয়ানা, যারা আপনার কাছে জন্তু-জানোয়ারের অধম এ দেশের সেই কালো মানুষের হয়ে, আর একটা আমার নিজের জন্যে।

তুই! তুই এ দেশের লোক নয়!—ফিংক সাপের মত হিসহিসিয়ে উঠল।

না, বোয়ানা। আমার দেশের নাম মানুষের দুনিয়া। আপনার দক্ষিণ আফ্রিকা তার মধ্যে নেই।

চাবুকটা নিরুপায় হয়ে হজম করে ফিংক বললে,—তাহলে তুই এ কাজে এসেছিলি কেন?

ওই আপনার অদ্ভুত বিজ্ঞাপনের টানে, বোয়ানা। একটা-কিছু শয়তানী প্যাঁচ এর মধ্যে আছে সন্দেহ করে।

কিন্তু কালাহারি মরু তুই চিনলি কী করে? বিনা জলে দশ দিনের পথ গেলি এলি কী করে? ভেড়ার ছানাও কেমন করে আনলি?—ভয় ভাবনা রাগের চেয়ে ফিংকের কৌতূহল তখন বেশি।

বক্‌শিশ নেওয়া যখন পালিয়ে যাচ্ছে না, আর তা নেবার পর কানে শোনবার অবস্থা আপনার যখন নাও থাকতে পারে, তখন

প্রশ্নগুলোর জবাবই আগে আপনাকে দিয়ে নিই। এই কালাহারি মরু আমার কাছে নতুন নয়, বোয়ানা। এখানকার আদিবাসী হোটেনটটদের খোঁজ নেবার জন্যে আগেও কবার এসেছি···

হঠাৎ গৌরের কাশিটা বড় বেয়াড়া হয়ে উঠলেও ঘনাদা আজ আর ভ্রূক্ষেপ না করে বলে চললেন,—জল সঙ্গে না থাকলেও এ অঞ্চলের গোপন সব ঝরনা আমার জানা, আর তাও যেখানে নেই সেখানে যার কথা আগে বলেছি সেই ত্‌সোমা অর্থাৎ বুনো তরমুজ খুঁজে বার করেই কাজ চালিয়েছি। ভেড়ার ছানা অবশ্য আমাকে চুরি করতে হয় নি। দক্ষিণ আফ্রিকার সব ধলাই আপনার মত নয়। মানুষের রক্ত যাদের শরীরে বয়, এমন দু'চারজনও আছে। কীট্‌মানসুফ-এ এরকম একজনের সঙ্গে আমার একটু দোস্তি আছে। টাঙ্গানাইকায় একবার শিকারে গিয়ে আলাপ। তার ধারণা, এক খ্যাপা হাতির আক্রমণ থেকে তাকে আমি বাঁচিয়েছি। সেই বন্ধুর কাছেই আপনার কথা বলে ক'দিনের জন্যে দুটো ভেড়ার ছানা ধার করে এনেছি। ইচ্ছে আছে কালই আপনার জীপ নিয়ে সেখানে রওনা হব ফিরিয়ে দেবার জন্য।

ফিরিয়ে দেবে আগেই ঠিক করে রেখেছিলে!—ফিংকের উন্নতি শুধু তুই থেকে তুমিতে। গলায় নইলে বিস্ময়ের সঙ্গে তেমনি 'পারলে ছিঁড়ে ফেলা' আক্রোশের জ্বালা!

হ্যাঁ, বোয়ানা, আগেই ঠিক করেছিলাম। নইলে সত্যিই চুরি করে আনতে তো পারি না! কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। মেঘলা রাত। ঠাণ্ডা বাড়ছে। বক্‌শিশটা নেওয়া এবার সেরে ফেলি।

নিজের হাতের দিকে চেয়ে একটু থেমে আবার বললাম,—হাতে রিভলভারটা থাকলে আবার জুত হয় না।

রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ফিংক বুনো মোষের মত আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

তারপর প্রায় উট-কাঁটার আগুনের ওপর পড়ল সচাপ্টে।

ডান গালের চড়টা একটু জোরেই হয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে তাকে তুলে বাঁ গালে একটু আস্তেই মারলাম। শতরঞ্জির ওপর খাবার প্লেটগুলোর কয়েকটা ভাঙল।

সেইখানেই তাকে ফেলে রেখে জীপে গিয়ে একটা দড়ি নিয়ে এলাম। হাত আর পা দুটো তাই দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বললাম,—এটা বক্‌শিশের ফাউ। জোহান্নেসবার্গে যা দিয়েছিলেন, কড়ায় গণ্ডায় শোধ না করলে চিরকাল ঋণী থাকব যে! রাত্তিরটা এখানেই কাটান। কম্বল ঢাকা দিয়ে যাচ্ছি। সকালে উঠেই কীট্‌মানসুফ রওনা হয়ে যাবেন, কী বলেন?

জবাবে ফিংক তার আফ্রিকানস্ ভাষায় কুৎসিত একটা গালাগাল দিলে শুধু।

জীপ থেকে আর একটা কম্বল নিয়ে বেশ একটু দূরে একটা লুকোন জায়গায় গিয়ে শুলাম। কিছুক্ষণ অন্ততঃ জেগে থাকবার ইচ্ছে থাকলেও ক'দিনের ধকলে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

সকালে উঠে যা ভেবে রেখেছিলাম তাই হয়েছে দেখলাম। ফিংক রাত্রেই জীপ নিয়ে পালিয়েছে।

ফিংক পালাবে বলেই ভেবে রেখেছিলেন?—শিশিরের হতভম্ব প্রশ্ন।

হ্যাঁ, সেই জন্যেই বাঁধন এমন দিয়েছিলাম যাতে নিজেই ছিঁড়তে পারে।

ফিংককে তাহলে সেই ভেড়ার ছানা দুটো নিয়েই পালাতে দিলেন?—আমার গলায় যেন আওয়াজই বার হতে চায় না।

হ্যাঁ তাই দিলাম, কিন্তু পালাবে আর কোথায়! তার কম্পাস আগেই বিগড়ে জীপটা একটু ঘুরিয়ে রেখে দিয়েছি। মেঘলা রাতে আকাশের তারাও দেখতে পাবে না দিক ঠিক করতে। জীপ নিয়ে নাক বরাবর সোজা গিয়ে উঠবে ওই কীট্‌মানসুফ-এই। সেখানে তার জন্যে অভ্যর্থনা-সভা তৈরী। বমাল সমেত গ্রেপ্তার আর

হাজত। নিজে নিয়ে গিয়ে ধরিয়ে দেবার ঝামেলাটা বাঁচালাম তাকে পালাবার সুযোগ দিয়ে।

হামি কী বলবে বড়াবাবু!—নিরুপায় বনোয়ারীর কাকুতি এবার শোনা গেল।

দেখ তো হে, কে এবার এসেছে জ্বালাতন করতে!—ঘনাদা তাচ্ছিল্যভরে হুকুম করলেন আমাদের মুখের চেহারাগুলো পড়ে নিয়ে।

শিশির তাই দেখতেই গেল।

মিনিট পনরো বাদে যখন ফিরে এল, তখন ঘনাদা তার সিগারেটের টিনটা ভুলে পকেটে করে তাঁর টঙের ঘরে উঠে গেছেন।

ব্যাপার কি শিশির?—আমরা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

বিশেষ কিছু নয়।—শিশির নাকটা একটু উপরে তুলে বাতাসটা শুঁকতে শুঁকতে বললে,—ওই!

ওপর থেকে তখন পয়লা নম্বরের অম্বুরী তামাকের গন্ধ ভেসে আসছে।

ওই মানে?—আমরা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—ওই তামাকের গন্ধ?

হ্যাঁ। বড় রাস্তার তামাকের দোকান থেকে ঘনাদা সবচেয়ে সরেস অম্বুরী তামাক কবে বুঝি কিনে এনেছিলেন দামটা বাকী রেখে। তারপর ওধার আর মাড়ান নি। আজ দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে দোকানের মালিক পিছু-পিছু এসেছে তাগাদা করতে। নীচে সে-ই গোলমাল করছিল।

তা তুমি কি করলে কী? আমাদের ব্যাকুল প্রশ্ন।

কী আর করব! তাকে খুশী করেই বিদায় করতে হল। এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঘনাদার শান্তিভঙ্গ তো আর করা যায় না! গৌরের রেন-কোট যখন গেছে, তখনই জানি ওর হিংসেতে একটা কিছু লোকসানের ফাঁড়া আমার আছেই।

গৌরের মুখে এতক্ষণে সত্যিই হাসি ফুটল।

চোখ

[illegible]

হিজিবিজি আবোল-তাবোল নয়।

ওপরে যা দেখা যাচ্ছে, ওই আঁকড়ি-বিকড়ি ধাধাটিই কষ্ট করে খাড়া করেছিলাম সকলে মিলে মাথা খাটিয়ে।

খামের ভিতরে ভরতে ভরতে ভেবেছিলাম আচমকা এই বিদ্‌ঘুটে প্যাঁচেই ঘনাদাকে কাবু করা যাবে।

কিন্তু আমাদের এমন সাজানো ফন্দিটা ঘনাদা এক মোক্ষম চালে ভেস্তে দেবেন ভাবতে পারি নি!

শিবু ভগ্নদূতের মত এসে চাঞ্চল্যকর শব্দটি দিলে।

—না, পাওয়া যাচ্ছে না!

প্রথমটা আমরা সবাই সামান্য একটু বিমূঢ় হলেও উদাসীন!

কী পাওয়া যাচ্ছে না?—জিজ্ঞাসা করলে শিশির।

পাওয়া যাচ্ছে না কাকে? ঘনাদাকে?—গৌরের প্রশ্নে একটু কৌতুকের আভাস।

না, ঘনাদা বহাল তবিয়তেই আছেন তাঁর টঙের ঘরে, কিন্তু,—শিবু একটু থেমে, আমাদের বেশ কয়েক মুহূর্ত উদ্বিগ্ন অনিশ্চয়তার

মধ্যে ঝুলিয়ে রেখে তারপর বললে,—পাওয়া যাচ্ছে না তার চশমা!

অ্যাঁ—আমাদের সবাইকার কণ্ঠেই এক আর্তনাদ।

চশমা পাওয়া যাচ্ছে না কী রকম! আমি সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বললাম, তারপর,—চিঠিটা দিয়ে আসবার সময়ই ত চোখে চশমা দেখলাম।

চোখে ত চশমা দেখেছ, কিন্তু চোখে চশমা দিয়ে করছিলেন কি?—গৌরের জেরা,—তোমার দেওয়া চিঠিটা পড়েছেন তোমার সামনে?

না।—আমায় স্বীকার করতে হল চিন্তিতভাবে,—তখন শনিবারের বাজারের ফর্দটা দেখছিলেন। আমায় চিঠিটা রেখে দিয়ে যেতে বললেন।

তারপর থেকেই চশমা উধাও!—শিবু করুণ স্বরে জানাল। —আমি সেই অবিশ্বাস্য কাহিনীই শুনে আসছি।

কিন্তু চশমা যাবে কোথায়?—আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, —ঘনাদা তো ঘর থেকে বাইরে আসেন নি। চশমা ঘরেই আছে নিশ্চয়। ঘনাদা খুঁজেছেন?

তন্ন তন্ন করে।—শিবু মুখের একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে জানাল, —অন্ততঃ ঘনাদার উক্তি তাই।

বেশ, আমরা গিয়ে খুঁজছি চলো।—গৌর উৎসাহভরে উঠে দাঁড়াল।

তিষ্ঠ বন্ধু।—শিবু বাধা দিলে,—কোন লাভ নেই। আমি কি ঘনাদাকে ওইটুকু সাহায্যও করতে চাই নি মনে করেছ! কিন্তু ঘনাদা তাতে নারাজ। যা গেছে তার জন্যে ঘরদোর তছনছ করা উনি পছন্দ করেন না।

পছন্দ করেন না!—শিশিরের মুখে অবিশ্বাসের বিস্ময়,—ওর আছে কী, যে তছনছ হবে! দুটো তোবড়ানো চটাওঠা টিনের

তোরঙ্গ, একটা আলনা আর শেল্‌ফের তাকে টিকে তামাক ছাড়া কটা আমাদেরই দেওয়া টুকিটাকি! এ ছাড়া ত শুধু তক্তপোশের বিছানা, কটা টুল আর গড়গড়াটা! তছনছ হবেটা কী?

জানি না!—শিবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে,—কিন্তু খুঁজে দেখবার নাম করতেই প্রায় খাপ্পা হয়ে উঠলেন। বললেন,—খুঁজবেটা কী? আমার চশমা আমি নিজে খুঁজতে কিছু বাকি রেখেছি! ও পাবার নয়।

তার মানে ও চশমা এখন আর ঘনাদা খুঁজে পাবেন না!—গৌর হতাশ স্বরে বললে,—চশমা না পেলে আর ও-চিঠি পড়া হবে না। আর যদি চিঠি না পড়া হয় তাহলে···

তাহলে এত তোড়জোড় ফন্দিফিকির খাটুনি হয়রানি সবই মাটি!—শিশির গৌরের অসমাপ্ত আক্ষেপটা পূরণ করে দিলে।

কিন্তু চশমা হারালে খুঁজে না হয় নাই পাওয়া গেল, নতুন চশমা আর হতে পারে না?—অন্ধকারে আমি একটু আশার আলো দেখবার চেষ্টা করলাম।

হ্যাঁ, আমরা নতুন চশমা কিনে দেব ঘনাদাকে!—শিশির উৎসাহ প্রকাশ করলে আমার প্রস্তাবে।

আজই নিয়ে যাচ্ছি চশমার দোকানে!—গৌরের মধ্যেও উৎসাহটা সংক্রমিত।

তাতেও ভরসা কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না।—শিবুই শুধু মাথা নাড়লে,—চশমা যাঁর এমন সময় বুঝে হারায়, তাঁকে নতুন চশমা গছানো কি যাবে!

তবু হাল ছাড়ব কেন!—গৌর হার মানতে প্রস্তুত নয় দেখা গেল। শিশির ও আমি তারই দলে!

কিন্তু যাবার ছুতো ত একটা চাই।—শিবু আবার বাগড়া দিলে,—গিয়েই চশমার কথা তুললে পত্রপাঠ বিদায়।

তাহলে···তাহলে···ওই শনিবারের বাজারের ফর্দ!—গৌরই

সমস্যাটার সমাধান করে ফেললে,—আমরা যেন ফর্দটা সংশোধন করাতেই যাচ্ছি।

ঘনাদার তেতালার ঘরে এ বিবরণটা টেনে তোলবার আগে ঘনাদার চশমা হারানোতে কেন আমরা এতখানি বিচলিত, একটু বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

এবারে ঘনাদাকে তাতাবার যে ফন্দিটি সবাই মিলে বার করেছিলাম তা প্রায় নিখুঁত। সেই ফন্দিরই প্রথম ধাপ স্বরূপ একটি চিঠি সকাল সাতটা বাজতে না বাজতে ঘনাদার টঙের ঘর থেকে গড়গড়ার আওয়াজ পাওয়া মাত্রই দিয়ে এসেছি।

চিঠি তৈরী করতে বেশ কিছু কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।

খামে বন্ধ চিঠি। ওপরে ইংরেজীতে পরিষ্কার ভাবে টাইপ করা নাম ঠিকানা, মিঃ ঘনশ্যাম দাস, ৭২ নং বনমালী নস্কর লেন, কলিকাতা। কিন্তু খামটা ছিঁড়ে ভেতরের চিঠিটা বার করে খুললেই চক্ষুস্থির যাতে হয় তারই ব্যবস্থা। চিঠিটির নমুনা একেবারে প্রথমেই দেওয়া আছে।

এ চিঠির মসলা সংগ্রহ করতে গৌর আর আমাকে তিন দিন ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ঘণ্টা তিনেক করে ভারী ভারী সব কেতাব ঘাঁটতেও হয়েছে। তারপর রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে শিবু ও শিশিরকে নিয়ে চারজনে মিলে চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে বাজার চষে কিনে আনা পাতলা লম্বা পার্চমেণ্ট কাগজে মুনশীয়ানা করেছি। মুনশীয়ানা অদ্ভুত আজগুবি সব হরফ নিয়ে। কিছু হরফ প্রাচীন মিশরীয় লিপি থেকে নেওয়া, কিছু প্রাচীন হাবসী, কিছু আমাদের ভারতবর্ষেরই ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী থেকে। এরই মধ্যে অন্য অজানা হরফও বাদ যায় নি। এই হরেক রকম অক্ষর এলোপাথাড়ি মিলিয়ে যে খিচুড়িটি তারপর কাগজে তোলা হয়েছে তা যে-কোন প্রাচীন লিপিবিশারদ পণ্ডিতচূড়ামণির মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

চিঠিটি ডাকে নয়, যেন হাতেই কেউ দিয়ে গেছে বিকেলে জবাব নিয়ে যাবার জন্যে। ঘনাদাকে সরলভাবে কিছুই যেন না জেনে চিঠিটি দিয়ে এসেছি ওই কথা বলে।

তারপর ঘনাদা কখন কৌতূহলভরে চিঠিটি খোলেন তারই অপেক্ষায় তাঁর ওপর নজর রাখা চলছে। আধঘণ্টা অন্তর অন্তর কেউ-না-কেউ কোন-না-কোন ছুতোয় একবার ওপরে গিয়ে নাটকটা শুরু হল কিনা দেখে আসছে।

প্রথমে গেছে গৌর যেন গতকালের খবরের কাগজটা ঘনাদার ঘরেই আছে কিনা খোঁজ করতে। একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন নাকি তার না দেখলেই নয়।

তখনও পর্যন্ত যাকে বলে অল কোয়ায়েট অন দ্যা ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট। সব ঠাণ্ডা চুপচাপ। ঘনাদা কলকেতে টিকে সাজাচ্ছেন তন্ময় হয়ে।

গৌরকে দেখে একটু ভুরু কুঁচকেছেন অবশ্য। এমন অসময়ে গৌরের আবির্ভাবটা ত ঠিক স্বাভাবিক নয়।

গৌরকে তাড়াতাড়ি তাই কৈফিয়তটা দাখিল করতে হয়েছে,—কালকের কাগজটা আপনার ঘরে নাকি? কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

আমার ঘরটা কি 'লস্ট প্রপার্টি স্টোর'? কোথাও যা খুঁজে পাওয়া যায় না তা এখানেই পাওয়া যাবে!—ঘনাদা একটু যেন বাঁকা মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সেটা এমন কি গ্রাহ্য করবার মত মনে হয় নি গৌরের।

না না, একটা বিজ্ঞাপন দেখবার ছিল কর্মখালির।—বলে অজুহাত দেখিয়ে একটু যেন লজ্জিত হয়ে চলে এসেছে গৌর।

তারপর গেছে শিশির ঘণ্টাখানেক বাদে। তাকে অবশ্য একটু ঘুষ নিয়েই যেতে হয়েছে। একেবারে নতুন একটা সিগারেটের টিন। দুষ্প্রাপ্য বিদেশী ব্র্যাণ্ড।

এই ব্র্যাণ্ডটা হঠাৎ পেয়ে গেলাম ঘনাদা!—শিশির যেন

খুশীতে ডগমগ হয়ে বলছে,—প্রসাদ না করে ত খেতে পারি না। আপনার সামনেই তাই খুলতে নিয়ে এলাম।

ঘনাদার মুখের উজ্জ্বলতাটা আশানুরূপ দেখা যায় নি। কয়েক ওয়াট্ যেন কম। সেটা অবশ্য এমন কিছু ধর্তব্য নয়।

শিশির ঢাকনির পাক দিয়ে এয়ারটাইট টিনের পর্দাটা কাটতে কাটতে আড়চোখে ঘনাদার দিকে লক্ষ্য রেখেছে। না, ভাবান্তর বিশেষ নেই। চিঠির প্রতিক্রিয়া কিছু বোঝা যায় নি। এখনো সেটা খামেই বন্দী আছে বোধহয়। সিগারেট একটা মুখে ও বাকি কয়েকটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে, দেবার মত কোন সংবাদ না নিয়েই শিশিরকে ফিরতে হয়েছে।

আমরা তখনও কিন্তু উতলা হইনি। মেওয়া ফলাতে গেলে সবুর করতে হয় এ আর কে না জানে! একটু শুধু ধৈর্য চাই।

দুপুরে খাওয়াদাওয়া সেরে যে যার কাজকর্মে বেরিয়েছি। ফিরে এসে আমাদের আড্ডাঘরে জমায়েত হয়েছি এই বিকেলে। এইবার একটা কিছু যে হবে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই তখন। ঘনাদার ঘরে যা ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে তা একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। ও আর বিফল হবার নয়। বাদলার দিন, তাই সলতেটা ধরতে একটু বোধহয় দেরি হচ্ছে। কিন্তু একবার ধরলে আর দেখতে হবে না। এক সঙ্গে তুবড়ি পট্‌কা ফাটবে।

সলতেটা ধরতে দেরি হওয়ার কারণটা মনে মনে এঁচে নিয়েছি। ঘনাদার তিন কুলে কোথাও কেউ আছে বলে ত এতদিনে জানতে পারি নি। সত্যিকার চিঠিপত্র তাঁর নামে আর আসে কবে?

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর মৌজ ক'রে গড়গড়ায় টান দিতে দিতে রসিয়ে রসিয়ে পড়বার জন্যেই বোধহয় চিঠিটা তিনি মজুদ রেখেছেন ধরে নিয়েছি।

বিকেলে এসে জমায়েত হবার পরই তাই শিবু গেছে সরজমিনে

তদারক করে একেবারে হালের অবস্থাটা জেনে আসতে, যাতে আমরা গিয়ে নাটকটা জমিয়ে তুলতে পারি।

কে কোন্ ভূমিকা নেবে তাও ঠিক করা হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে নিজের নিজের সংলাপ।

যেমন শিশির গিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলবে,—বড় জ্বালাতন করে যত আজেবাজে লোক। নিচে কে একটা চীনেম্যান গোছের চেহারার লোক এসে দাস সাহেবকে চাই বলে ঝামেলা লাগিয়েছিল। দিয়েছি দূর করে তাড়িয়ে!

আমরা তার আগেই জমায়েত হয়ে বসব ঘনাদার তক্তপোশে, মেস সংক্রান্ত একটা গুরুতর বিষয়ে যেন পরামর্শ নেওয়ার জন্যে।

আমি হাঁ হাঁ করে উঠব শিশিরের কথায়—আরে করেছে কি! না জেনে-শুনে তাড়িয়ে দিলে কী বলে!

তা তাড়াব না! শিশির আমার উপরই খাপ্পা হবে,—ঘনাদা এখানে নিরিবিলিতে অজ্ঞাতবাসে আছেন! যাকে তাকে ওঁর ঠিকানা জানতে দিলে আর রক্ষে আছে। দিনরাত ওঁকে অতিষ্ঠ করে ছাড়বে না? আজ চীনেম্যান, কাল জাপানী, পরশু ভিয়েটনামী, তারপর দিন মাওরি, তারপর পেরুভিয়ান···

শিশির গোটা প্রশান্ত মহাসাগরটাই পার হয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে থামিয়ে আমায় বলতে হবে,—আরে থামো, থামো। তোমায় আর ভূগোলের বিদ্যে জাহির করতে হবে না। কিন্তু যাকে তাড়ালে সে-যে ঘনাদার জানা লোক। দরকারী কি ব্যাপারে সকালে চিঠি দিয়ে গেছে, বিকেলে উত্তর নিতে আসবে বলে। আমিই ত চিঠিটা ঘনাদাকে দিয়ে গেছি সকালে।

তা এত কথা শিশির জানবে কী করে?—গৌর এবার শিশিরের পক্ষ নেবে—আমাদের কাউকে কিছু বলেছ তুমি ঘুণাক্ষরে?

এবার আমায় ক্ষুণ্ণ হতে হবে—জানাব আবার কী? শিশিরের

অতটা মাতব্বরি করবার ত দরকার ছিল না। লোকটাকে দাঁড় করিয়ে ওপরে এসে খবর নিয়ে গেলেই ত পারত। উনি একেবারে ঘনাদার এত বড় পাহারাদার হয়ে উঠতে গেলেন কেন? এখন কী কেলেঙ্কারি হল দেখো দিকি?

কেলেঙ্কারি বলে কেলেঙ্কারি!—শিবু আমার কথাতেই সায় দেবে,—জরুরী কোন চিঠি নিশ্চয়! চীনেম্যানের মত চেহারা বলছে শিশির। সত্যিই ভিয়েটনাম কি ভিয়েটকঙ্-এর কেউ প্রাণের দায়ে ঘনাদার পরামর্শ নিতে এসেছিল কিনা কে জানে!

শিশির এবার কাঁচুমাচু মুখ করে ঘনাকে জিজ্ঞাসা করবে,—সত্যি জরুরী নাকি ঘনাদা?

আমরাও উদ্বিগ্ন হয়ে চাইব ঘনাদার দিকে।

কী চিঠি ঘনাদা! কার চিঠি! কই চিঠিটা গেল কোথায়?—ইত্যাদি ব্যাকুল প্রশ্ন বর্ষিত হবে ঘনাদার উদ্দেশে।

ঘনাদা সে-সব প্রশ্নবাণ কী অস্ত্রে কাটাবেন, চিঠিটা বেমালুম উড়িয়ে দেবেন, না তার সৃষ্টিছাড়া ব্যাখ্যা খাড়া করবেন, তাই দেখবার জন্যেই এত কাঠখড় পোড়ানো।

আর ঘনাদা কিনা এক চশমা হারাবার প্যাঁচেই আমাদের সব চাল ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন!

না, সেটি হতে দেওয়া চলবে না। গাঁটের পয়সা গচ্চা দিয়ে ঘনাদার চশমা কিনে দিতে হয় তাতেও রাজী, কিন্তু ঘনাদাকে ওই প্যাঁচে বাজিমাত করতে দেওয়া হবে না।

সিঁড়ি থেকেই ঝগড়াটা তুমুল করে নিয়ে ছাদে উঠলাম।

লাঠালাঠিটা শিশির আর গৌরের মধ্যেই জমে ভালো। তারা দুজনেই তাই এবারের মহড়া নিয়েছে।

কেন এ শনিবার নয় কেন!—সিঁড়ি থেকেই ঘনাদার কানে পৌঁছোবার মত গৌরের চড়া গলা শোনা গেল,—তোমার ইস্টবেঙ্গল লীগ পায় নি বলে আমাদের সবাইকে কি হবিষ্যি করতে হবে!

হবিষ্যি করবে কেন!—শিশিরও হেঁড়ে গলা ছাড়ল,—না খেলা পয়েন্ট নিয়ে লীগ পেয়ে মোচ্ছব করো। কিন্তু এ শনিবারে আর ওই পায়রার মাংস নয়। বুনো বাপী দত্ত হাঁসে অরুচি ধরিয়েছিল, এবার আকাশে পায়রা উড়তে দেখলেও গা বমি করিয়ে ছাড়বে তোমরা।

গলাবাজিটা ছাদে তুলে একেবারে ঘনাদার ঘরের ভেতর পৌঁছে দিলে দুজনে!

বলুন ত ঘনাদা!—গৌরই প্রথম ঘনাদাকে সালিসি মানলে,—পায়রার মাংস কিছু খারাপ জিনিস! বলে কিনা এ শনিবারে অন্য কিছু করো। আরে, অন্য কিছু পাচ্ছি কোথায়? বাজারে তেল নেই, মাছ নেই, দুধ নেই, সন্দেশ পর্যন্ত বাতিল, তা নতুন কিছু জোটাব কোথা থেকে!

যাঁর উদ্দেশে এই অভিনয় সেই ঘনাদা তখন ইহজগতে নেই। মুখে তাঁর শিশিরের সকালে দেওয়া একটি সিগারেট জ্বলছে, মনটা যেন তারই ধোঁয়ার সঙ্গে ঊর্ধ্ব আকাশে গেছে ছড়িয়ে।

কিন্তু এমন নির্লিপ্ত নির্বিকার তাঁকে থাকতে দিলে ত চলবে না। শিশির শনিবারের বাজারের ফর্দটা তাঁর নাকের সামনে বাড়িয়ে ধরে বললে,—তা বলে ভদ্রলোকের এক কথার মত মেন্যুর যেন আর নড়চড় নেই। আর শনিবারে যা, এবারেও তাই। ফর্দটা একবার দেখুন না।

নাকের কাছে ওরকম একটা লম্বা কাগজ ঝুলিয়ে রাখলে যোগী-ঋষিরও ধ্যান ভঙ্গ হয়। ঘনাদাকে তুরীয়লোক থেকে একটু নামতে হল। কাগজটা বাঁ হাতে একটু সরিয়ে উদাসীনভাবে বললেন,—ফর্দ আমি দেখেছি।

আপনার দেখা ত!—শিশির ঘনাদার কথাটায় কোন গুরুত্বই না দিয়ে যা একখানি ছাড়ল, আমরা তাতে হাসি চাপতে কেশে অস্থির।

বললে,—খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে আপনি ত বিরাগী মানুষ। চোখ বুলিয়েই মঞ্জুর করে দিয়েছেন। এখন একবার ভালো করে দেখুন দেখি। এর নাম শনিবারের খ্যাঁট ?

আমাদের সংক্রামক কাশির হিড়িকেই বোধহয় ভুরু কুঁচকে ঘনাদাকে ফর্দটা আবার নাকের কাছ থেকে সরিয়ে বলতে হল,—ও ফর্দ আমায় দেখানো মিছে।

—কেন ? কেন ?—গৌর, শিশির এবং আমি একসঙ্গে উৎকণ্ঠিত।

কেন আর।—শিবুই ঘনাদার হয়ে কৈফিয়ত দিলে যেন আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে,—ঘনাদার চশমা হারিয়ে গেছে।

চশমা হারিয়ে গেছে!—আমরা সহানুভূতিতে কাতর হয়ে উঠলাম,—কখন, কোথায় হারাল ?

হারিয়েছে এই ঘরেই।—শিবুই যেন ঘনাদার মুখপাত্র,—কিন্তু সে আর পাবার নয়।

বললেই হল পাবার নয়!—আমরা বিরক্ত শিবুর ওপর,—আমরা এখুনি খুঁজে বার করছি।

উঁহুঃ!—শিবুই রুখে দাঁড়াল যেন,—খোঁজাখুঁজির ঘনাদা কি কিছু বাকী রেখেছেন! মিছিমিছি ঘরদোর হাঁটকে আর জ্বালিও না!

তাহলে ?—শিবুর নিষেধ চট্ করে শিরোধার্য করে নিলাম আমরা,—ঘনাদার চশমার ব্যবস্থা ত করতে হয় এখুনি।

আই-ক্লিনিকে চলুন ঘনাদা!—শিশিরের অনুরোধ।

আই-ক্লিনিকে কেন ?—গৌরের প্রতিবাদ—এখানেই চোখের ডাক্তার ডাকছি।

গৌর বেরিয়ে যায় যেন তখুনি।

দাঁড়াও।—ঘনাদাই থামালেন তাকে,—চোখের ডাক্তার ডাকিয়ে লাভ নেই।

কেন ?—আমরা বিমূঢ়—চোখের ডাক্তার একটা চশমার ব্যবস্থা

করতে পারবে না আপনার! আপনার ত রীডিং গ্লাস, যাকে বলে পড়ার চশমার দরকার।

না।—ঘনাদা গম্ভীরভাবে জানালেন।

তাহলে বাইফোক্যাল?—শিবুর জিজ্ঞাসা।

না।—ঘনাদার সংক্ষিপ্ত জবাব।

তাহলে অ্যাস্‌টিগম্যাটিক লেন্‌স?—চক্ষুবিদ্যা সম্বন্ধে চূড়ান্ত জ্ঞান জাহির করলাম।

না।—ঘনাদা তাও নাকচ করে দিয়ে বললেন,—প্রেসবাই-ওপিয়ার সঙ্গে আমার চোখ ডাইক্রোম্যাটিক্। ফোটেরিথ্‌স নয়, স্কোটেরিথ্‌স্।

অ্যাঁ!!—ঘনাদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমাদের সকলের চোখই তখন ছানাবড়া।

কিন্তু দেখলে অমন ভয়ংকর ত মনে হয় না!—শিবু যেন ভয়ে ভয়ে বললে।

একটু শুধু বাঁকা-বাঁকা লাগে!—শিশির বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করলে।

হ্যাঁ, দেখে অতটা বিদ্‌ঘুটে বলে বোঝা যায় না—গৌরের যেন ঘনাদাকে সান্ত্বনা।

দেখে তোমরা কী বুঝবে!—ঘনাদার গলায় ঝাঁজ,—লণ্ডন প্যারিস্ বেরলিন ভিয়েনাই হার মেনেছে নিদান নিতে। শেষে টাইওয়ানের এক হাতুড়ে ডাক্তার চিং স্থন্ রোগ ধরে ওই আজব চশমা নিজেই বানিয়ে দেন।

সেই চশমা আপনি হারালেন!—আমাদের সম্মিলিত হাহাকার।

হ্যাঁ, হারিয়েছি। তবে আগেই হারানো উচিত ছিল।—ঘনাদা যেন অনুশোচনায় দগ্ধ।

আমরা সবাই এবার হাঁ। তক্তপোশের ওপর ভাল জায়গাটা

আগেই দখল করে শিবুই কোন রকমে ঢোঁক গিলে বলে ফেললে, —কেন, চশমাটা অপয়া বুঝি ?

অপয়া !—ঘনাদাকে যেন অনেকদূর পর্যন্ত অতীতে দৃষ্টি চালাতে হল,—তা অপয়াও বলতে পারো। ও চশমা আগে হারালে, একশ বছরের ওপর যা লুপ্ত বলেই জানা ছিল, দুনিয়ার সবচেয়ে দামী সেই একটা বিরল প্রাণীর জাতকে প্রথম খুঁজে বার করে তার ধ্বংসের সহায় হবার মনস্তাপে নিজেকে ধিক্কার দিতে হত না।

তক্তপোশের ওপরেই বসে থাকলেও আমাদের সকলের মাথাই তখন ঘুরতে শুরু করছে !

দাঁড়ান। দাঁড়ান।—শিশির প্রথম নিজেকে একটু সামলে আবেদন জানালে,—ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে নিই মাথায়। একশ বছরের ওপর লুপ্ত বলে জানা ? তার মানে অন্ততঃ একশ বছর সে প্রাণীর খোঁজ কেউ কোথাও পায় নি ?

হ্যাঁ, শেষ সে প্রাণী দেখা যায় ১৮৩০-এ। ঘনাদা ব্যাখ্যা করলেন,—তারপর পৃথিবী থেকে যেন একেবারে লোপাট !

সে বিরল প্রাণী আবার পৃথিবীর সবচেয়ে দামী !—গৌর চক্ষু বিস্ফারিত করে আমাদের মনে করিয়ে দিলে।

দামী কি রকম শুনবে ?—ঘনাদা অনুকম্পাভরে বোঝালেন, —সেই প্রায় দেড়শ বছর আগেই সে প্রাণীর একটি 'ফ্যর' অর্থাৎ লোমওয়ালা চামড়ার দাম ছিল নিদেন পক্ষে আট থেকে ন' হাজার টাকা !

বলেন কি !—শিবু হাঁ হয়ে বললে,—উত্তর মেরুর রুপোলী খেঁকশেয়াল কি রাশিয়ার দুধে আরমিন্, মানে ভাম নাকি ?

বোধহয় কারাকুল ভেড়া !—গৌর ঘনাদার কাছে শোনা গল্প থেকেই বিদ্যে জাহির করলে।

না, ভ্যল্পেস্ ইয়াগোপস্ অর্থাৎ মেরুর শেয়াল, কি ম্যসটেলা আরমেনিকা মানে রুশ খটাশ নয়। ওভিস স্টিয়াটোপিনা মানে

যাকে কারাকুল ভেড়া বলে তাও না।—ঘনাদা আমাদের কুপোকাত করে বললেন—এ সব প্রাণী ত লুপ্ত বলে মনে করার কারণ হয় নি কখনো, তা ছাড়া ওদের 'ফ্যর'-এর দামও অত নয়।

তাহলে প্রাণীটা কী?—ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করতে হল এবার।

ল্যাট্যাক্স লুট্রিস!—ঘনাদা মোলায়েম গলায় বললেন,—মানে সমুদ্রের ভোঁদড়।

সমুদ্রের ভোঁদড়! কয়েকটা ঢোঁক গিলে জিজ্ঞেস করতে হল, —তার অত দাম? এ ভোঁদড় আবার লুপ্তও হয়ে গিয়েছিল?

হ্যাঁ।—ঘনাদা আমাদের দিকে করুণাভরে চেয়ে বললেন,—সমুদ্রের এই ভোঁদড়ের লোমওয়ালা চামড়ার লোভে মানুষ নির্মম পিশাচের মত তা শিকার করেছে একদিন। হাজার হাজার 'পেল্ট' মানে ওই লোমওয়ালা চামড়া শুধু চীনদেশেই চালান গেছে সেখানকার মান্দারিনদের জন্যে। রাশিয়া সেদিন আলাস্কা আর ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরে যে উপনিবেশ বসিয়েছে, এই সামুদ্রিক ভোঁদড়ের প্রলোভনই তার জন্যে অনেকটা দায়ী। স্পেনের নাবিকেরাও ওই অঞ্চলটা চষে বেড়িয়েছে তাদের পালতোলা স্লুপে এই ভোঁদড়ের খোঁজে। এ ভোঁদড়ের 'পেল্ট'-এর মত এমন উজ্জ্বল ঘন আর টেঁকসই এ জাতের জিনিস আর হয় না। তার সবচেয়ে কদর ছিল চীন সাম্রাজ্যের মান্দারিনদের কাছে। মানুষ তাই এমন লুব্ধ নৃশংসভাবে এ প্রাণীটি শিকার করেছে যে তার অস্তিত্বই মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। অন্ততঃ ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর এ প্রাণীর সন্ধান আর কেউ পায় নি।

এই ভোঁদড় আপনি খুঁজে বার করেছেন আবার?

খুঁজে বার করেছেন বলে আপনার আফসোস?

তখন চশমা হারালে এ ভোঁদড় আর খুঁজে পেতেন না?

আমাদের প্রশ্নবাণ শেষ হবার পর ঘনাদার কিন্তু আর সাড়াশব্দ নেই। হাতের সিগারেটের শেষটুকু দরজা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার যেন তিনি উদাস হয়ে গেলেন কোন শূন্যতার ধ্যানে।

গলতিটা ধরে ফেলে শিশিরই তা শোধরালে চটপট।

সকালের খোলা টিনটা পুরোই ঘনাদার সামনে ধরে দিয়ে বললে,—আর একটা খেয়ে দেখবেন নাকি!

বলছ?—ঘনাদা অতিকষ্টে যেন নিজেকে মর্ত্যভূমিতে নামালেন।

শিশির ততক্ষণে একটা সিগারেট তাঁর আঙুলে ধরিয়ে দিয়ে লাইটারটাও বার করে ফেলেছে। ঘনাদার সিগারেট ধরানো পর্ব শেষ হবার পরও খানিক অপেক্ষা করতে হল আমাদের। পর পর তিনটি সুখটান দিয়ে আমাদের দিকে একটু যেন প্রসন্নভাবে চেয়ে তিনি বললেন,—হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম! ও, ডক্‌টর্ চিং সুনের কথা।

না, বলছিলেন ওই চশমা আর ভোঁদড়ের কথা!—আমাদের সবিনয়ে একটু শোধরাবার চেষ্টা করতে হল।

ও সবই এক। চিং সুন আর চশমা আর ভোঁদড় সব একসঙ্গে জড়ানো। ঘনাদা শিশিরের রাখা সিগারেটের টিনটা একেবারে কোলের কাছে টেনে নিয়ে শুরু করলেন,—এখন টাইওয়ান বলেই সকলে যা জানে, তখন আমাদের মত বাইরের লোকের কাছে তার নাম ছিল ফরমোজা দ্বীপ। ফরমোজা তখন জাপানের দখলে। তারা দ্বীপটির চীনে নাম টাইওয়ান সরকারীভাবে নিলেও চালু করতে পারে নি। এই ফরমোজা দ্বীপের এখনকার টাইপে তখনকার টাইহোকু শহরেই চিং সুনের সঙ্গে আমার আলাপ। চীনের লিপির কিছু অতি প্রাচীন নিদর্শন পেয়ে ওই টাইহোকু-তেই তখন ও হরফের আদি উৎপত্তি নিয়ে কাজ করবার চেষ্টা করছি।

ঘনাদা একটু থেমে চকিতে আমাদের ওপর যেরকম ভাবে চোখ বুলিয়ে নিলেন, তাতে কেমন একটা অস্বস্তিতেই বোধ হয় চাপা হাসিটা খুকখুকে কাশি হয়ে আর বেরুতে পারল না। ঘনাদা আবার ধরলেন,—ও সব নিদর্শন হাড়ের ওপর খোদাই করা এক অতি প্রাচীন অজানা লিপি। ১৯০৩ সালে চীনের উত্তরের এক

জায়গা খুঁড়ে ওই সব খোদাই করা হাড়ের টুকরো কিছু পাওয়া যায়। তাতে প্রায় দু হাজার পাঁচশ রকমের হরফ দেখা গেছল। কিন্তু পণ্ডিতেরা ছ'শর বেশী অক্ষর তখনও চিনে উঠতে পারেন নি। এইটুকু শুধু জানা গেছে যে খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৬৬ থেকে ১১২২ পর্যন্ত চীনের শাং বা য়িন্ বংশের রাজত্বকালেই সেগুলো খোদাই হয়। হাড়ের লেখাগুলো সাধারণ মানুষের ভাগ্য নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে তখনকার গণকদের মাথা গুলোনো জবাব বলেই একদল পণ্ডিতের ধারণা। এই অদ্ভুত হরফগুলো নিয়ে মতভেদ থাকলেও সেগুলো চীনের যে চুয়ান লিপি পরে প্রবর্তিত হয়, তার চেয়ে পুরোনো বলেই সকলে তখন মেনে নিয়েছেন।

লি পো বলে আমার এক পণ্ডিত বন্ধুর বাড়িতে তখন আমি থাকি। বাড়িটা টাইপে শহরের এক প্রান্তে কীলাং নদীর ধারে। বাড়ির বাগানটা কীলাং নদীর পাড় পর্যন্ত নেমে গেছে। সেদিন সকালে সেই বাগানে একটা ক্যাম্‌ফর লরেল মানে কর্পূর গাছের তলায় বসে একটা আতস কাঁচ নিয়ে ওই খোদাই করা হাড় পরীক্ষা করছি, এমন সময় ফোল্ডিং টেবিলটার ওপর একটা ছায়া পড়তে দেখে একটু অবাক্ হলাম। ফিরে তাকিয়ে প্রথমে যেন পাথুরে প্রকাণ্ড একটা ঢিবিই দেখলাম মনে হল। তারপর বুঝলাম পাথুরে ঢিবি নয়, মানুষ।

আমায় পিছু ফিরতে দেখে মানুষটা একটু হেসে সামনে এগিয়ে এসে চীনে ধরনে কুর্নিশ পরিষ্কার ইংরেজীতে বললে,—মাপ করবেন মিঃ দাস। একটু বেয়াদবি করেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

আমি তখন লোকটার দিকে বেশ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে আছি। এক উত্তর অঞ্চলের বাসিন্দা ছাড়া সাধারণতঃ চীনেরা খুব লম্বা চওড়া হয় না। উত্তরের মাঞ্চুরিয়ার লোকদের হিসাবেও এ মানুষটা কিন্তু অদ্ভুত ব্যতিক্রম। চীনে রং চেহারা নিয়ে এ যেন এক কাফ্রী দৈত্যবিশেষ।

তার চেহারাটাই আমি লক্ষ্য করছি বুঝে লোকটি আবার হেসে বললে,—আমার চেহারাটা দেখে ভুল বিচার করবেন না। প্রকৃতির খেয়ালে আমার এই চেহারাটাই আমার অভিশাপ। দেখতে গুণ্ডা বদমাশ হলেও আমি নেহাত সামান্য চোখের ডাক্তার। তবে নিজের বেয়াড়া খেয়ালে পল্লবগ্রাহীর মত বিজ্ঞানের এটা সেটা নিয়ে একটু-আধটু চর্চা করি। নাম আমার চিং সুন্।

ডক্‌টর্ চিং সুন্ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। তাঁকে বসতে দেবার মত অন্য আসন সেখানে নেই। থাকলেও বিশেষ চেয়ার চাড়া তাঁর ভার সইতে পারত কিনা সন্দেহ। ডক্‌টর্ চিং সুনের পরিচয় পেয়ে এবার আমিও দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রতা করে বললাম,—আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম। কিন্তু আমার এ সৌভাগ্যের কারণটা জানতে পারি?

নিশ্চয়! নিশ্চয়!—চিং সুন্ তাঁর ঢোলা জোব্বা ধরনের চীনে জামার ভেতর থেকে একটা জুতোর বাক্স গোছের জিনিস আমার টেবিলের ওপর রেখে বললেন,—আপনি চীনের আদি লিপি নিয়ে খোঁজ খবর করছেন শুনে তখনকার কটা খোদাই করা হাড় আপনাকে দেখাতে নিয়ে এলাম। এগুলো আমাদের পরিবারেরই জিনিস। আমি পেপিং থেকে টাইওয়ানে চলে আসবার সময় এরকম কিছু পুরোনো জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসি।

চিং সুন্ এবার পিচবোর্ডের বাক্সটা খুলে যা বার করলেন তা আমি যা নিয়ে কাজ করছি সেই পুরোনো খোদাই করা কটা হাড়।

আগ্রহভরে হাড়গুলো একটু ওপর-ওপর পরীক্ষা করে বললাম,—এগুলো আশা করি আপনি দু-একদিনের জন্য রেখে যেতে পারবেন?

তা না হলে এনেছি কেন?—চিং সুন্ সবিনয়ে বললেন,—আমি দিন পাঁচেক বাদে এগুলোতে কি পেলেন জানতে আসব। ওই হাড়গুলোর তলায় একটা ব্রঞ্জের পাতও পাবেন। সেটা হাড়গুলোর চেয়েও প্রাচীন বলে জানি। তার হরফগুলো যদি পড়ে দিতে পারেন

তাহলে চিরকাল আপনার কেনা হয়ে থাকব। না শুধু তাই কেন, আপনার চোখের দোষ সারিয়ে দেব কৃতজ্ঞতায়।

এবার একটু না হেসে পারলাম না! বললাম,—আমার চোখের দোষ সারাবেন? লণ্ডন বের্‌লিন নয়, ভিয়েনা পর্যন্ত হার মেনেছে জানেন কি!

জানলাম।—চিং সুন্‌ও হেসে বললেন,—তবুও ওস্তাদরা যেখানে হার মানে, সেখানে হাতুড়েও কখনো কখনো বাজিমাত ত করে! আমায় সেইরকম হাতুড়ে মনে করুন না!

তাই করব।—আমার হাসি চেপেই বলতে হল,—কিন্তু আমার চোখের দোষ আছে বুঝলেন কী করে? এই আতস কাঁচ ব্যবহার করছি দেখে?

না, চোখের দিকে চেয়েই বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে। আচ্ছা, আজকের মত চলি।—বলে ডক্‌টর্‌ চিং সুন্‌ চলে গেলেন।

আবার এলেন ঠিক পাঁচ দিন বাদেই অমনি সকালবেলা।

আমি ইতিমধ্যে বন্ধু লি পো-র কাছে চিং সুন্‌ সম্বন্ধে যা জানবার জেনেছি। মানুষটা সত্যিই নাকি বেশ অদ্ভুত, অসাধারণ। উত্তর চীনের বেশ বড় বংশের ছেলে। পুরুষানুক্রমে চীন সাম্রাজ্যে তাঁদের বংশের লোকেরা মান্দারিন অর্থাৎ রাজদরবারের বড় বড় কর্মচারীর কাজ করেছেন। চীনে কুয়োমিনটাং-এর আধিপত্যের পরই চিং সুন্‌ দেশ থেকে পালিয়ে জাপানের অধীন এই টাইওয়ানে আশ্রয় নেন। চোখের ডাক্তার হিসেবে তাঁর নাম আছে, কিন্তু চোখের ডাক্তারির বাইরে আরো অনেক কিছু তিনি করেন যা নাকি বেশ রহস্যময়। চিং সুনের ডাক্তারি ছাড়া আরো অনেক বিদ্যায় দখল আছে। যৌবনে ইওরোপে তিনি অনেক কাল নানা জায়গায় এই বিদ্যা-চর্চায় কাটিয়েছেন। ধরন-ধারণ চালচলন একটু সন্দেহজনক হলেও চিং সুনের নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি টাইওয়ানের বাইরেও

পৌঁছেছে। তাঁর সম্বন্ধে আরো কয়েকটা মজার গল্পও টাইওয়ানের অনেকে জানে।

পাণ্ডিত্য যে তাঁর আছে চিং সুনের রেখে-যাওয়া খোদাই-করা হাড়গুলো আর ব্রঞ্জের পাতটা দেখেই বুঝেছিলাম।

দেখা করতে আসার পর চিং সুনকে সেই কথাই বললাম।

সেদিন সকালেও ওই বাইরের বাগানেই টেবিল পেতে বসে ছিলাম। বন্ধু লি পোকে রেখেছিলাম সঙ্গে। চিং সুনের বসবার উপযুক্ত একটা বাড়তি মজবুত আসন শুধু পাতিয়ে রেখেছিলাম আগে থাকতে।

চিং সুন এসে যথারীতি চীনে কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে সে আসনে বসবার আগেই জিজ্ঞাসা করলেন,—কী বুঝলেন আমার জিনিসগুলো দেখে মিঃ দাস?

কাগজের বাক্স থেকে বার করে হাড়গুলো আর ব্রঞ্জের পাতটা সামনের টেবিলের ওপরই সাজিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। চিং সুন্ বসবার পর তারই একটা খোদাই-করা হাড় তুলে নিয়ে বললাম গম্ভীর মুখে,—বুঝলাম আপনি সত্যি পণ্ডিত লোক!

তার মানে?—বড় চালকুমড়োর মত চিং সুনের গোল ভাব-লেশহীন মুখেও যেন একটু বিদ্রূপের ঝিলিক খেলে গেল,—প্রায় চার হাজার বছর আগেকার খোদাই-করা হাড় আর ব্রঞ্জের পাতে আমার পাণ্ডিত্যের কী প্রমাণ পেলেন! আমি ওগুলো ত সংগ্রহ করেছি মাত্র।

না, ডক্টর্ চিং সুন্—তাঁর হাঁড়ি-মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললাম,—ওগুলো আপনি জাল করেছেন। তবে সত্যিকার পাণ্ডিত্য না থাকলে যার তার পক্ষে এরকম জাল করা সম্ভব নয়।

আমি জাল করেছি ওগুলো!—চিং সুন্ যেন এখুনি ফেটে পড়বেন মনে হল,—আপনাকে আমি···

আহাম্মক গাড়োল ভেবেছিলেন! চিং সুন্‌কে থামিয়ে দিয়ে

মাখনের মত গলায় বললাম,—শুনলাম একবার এক জারমান না পোলিশ নৃতত্ত্ববিদ্ ওই টাইওয়ানের জংলী আদিবাসী চিন হোয়েনদের সম্বন্ধে গবেষণা করতে এলে তাঁকে বাঁদর নাচ নাচিয়েছিলেন এমনি বোকা বানিয়ে! আমাকেও তাই নাচাতে চেয়েছিলেন। আপনাকে সেই আনন্দটুকু দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত। তবে আপনার জ্ঞান বিদ্যার সত্যিই তারিফ করছি। হাড় খোদাইগুলো জাল করা এমন কিছু অবশ্য শক্ত নয়, কিন্তু ব্রঞ্জের পাতে যা খোদাই করেছেন তাতে সত্যিই বাহাদুরি আছে! ব্রঞ্জের পাতে খোদাই-করা শব্দ হল তিনটে আর তার অক্ষর হল আঠারোটা। আঠারোটা হরফের তিনটে নিয়েছেন নিশরের প্রাচীন লিপি থেকে, ব্রাহ্মী থেকেও নিয়েছেন তিনটে, খরোষ্ঠী থেকে নিয়েছেন চারটে, প্রাচীন সিন্দজিরলি, ইথিওপিয় আর টেমা থেকে দুটো করে—আর একটা করে ফিনিশীয় আর সেবিয়ান থেকে। আপনার খোদাই-করা অক্ষরগুলো এবার পর পর সাজিয়ে দেখা যাক। সব হরফগুলোই এক একটা ইংরেজী অক্ষরের প্রতিরূপ। প্রাচীন লিপির প্রতিরূপের বদলে ইংরেজী অক্ষর বসিয়ে সাজালে সবসুদ্ধ লেখাটা দাঁড়ায়—GHANASHAM DAS HOAXED. এ লেখার প্রথম শব্দ ঘনশ্যামের 'জি'টা নিয়েছেন মিশরী থেকে, 'এচ্'টা ব্রাহ্মী, 'এ'টা খরোষ্ঠী, 'এন'টা মিশরী, এবার 'এ'টা সিন্দজিরলি, 'এস'টা টেমা, এবার 'এচ্'টা প্রাচীন ইথিওপিয়ান, 'এ'টা ব্রাহ্মী, 'এম'টা মিশরী। দ্বিতীয় শব্দ দাস-এর 'ডি'টা টেমা, 'এ'টা ফিনিশীয়, 'এস'টা খরোষ্ঠী। তৃতীয় শব্দ হোক্স্ড্-এর 'এচ্'টা খরোষ্ঠী, 'ও'টাও তাই। 'এ'টা প্রাচীন ইথিওপিয়ান, 'এক্স্'টা ব্রাহ্মী, 'ই'টা সিন্দজিরলি আর 'ডি'টা সেবিয়ান। তা এত কষ্টই যদি করলেন ঘনশ্যামের 'ওয়াই'টা বাদ দিলেন কেন? এ সব লিপিতে না থাকলেও সিরিলিক্-এই 'ওয়াই' পেতেন।

আমার কথা শুনতে শুনতে চিং সুনের মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের

মত থমথমে হয়ে এসেছিল। ঝড় উঠে বাজের কড়াক্কড় শুরু হয় বুঝি। কিন্তু তার বদলে সেই চালকুমড়ো মুখে সে হঠাৎ গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

ঘনাদা থেমে এতক্ষণের ছাই-জমা সিগারেটে একটা রামটান দিলেন।

আমরা কিন্তু টাইওয়ানের চিং স্নুনের মত গলা ছেড়ে হাসতে পারলাম না। ঘনাদা প্রাচীন লিপির খিচুড়ির ব্যাখ্যান আরম্ভ করার পরই আমরা জিভ কেটে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি কয়েকবার! এখন কেউ লাল কেউ বেগুনী হয়ে সবাই আমরা অধোবদন। আমাদের অত ফন্দি খাটিয়ে লেখা চিঠির জারিজুরি সব অমন করে ভাঙবে যদি জানতাম!

ধরা পড়ার লজ্জাটা আর একটু রগড়ে বুঝিয়ে দিলেন ঘনাদা। রামটানের ধোঁয়ায় ঘরের হাওয়া ঘোলাটে করে বলতে শুরু করলেন, —হাসি শেষ করে ডক্‌টর চিং স্নুন একেবারে যেন লজ্জায় মরে গিয়ে বললেন,—আমার এখন নাকখত দেওয়াই উচিত মিঃ দাস!

দোহাই ও চেষ্টা আর করবেন না।—আমার হয়ে বন্ধু লি পো-ই তাঁকে ঠাট্টা করলেন,—একে আমাদের খাঁদা চীনে নাক। মাটিতে ঘষলে ওর আর চিহ্ন থাকবে না।

চিং স্নুন এ ঠাট্টায় আর একবার দাঁত বার করে হেসে বললেন, —তাহলে প্রায়শ্চিত্তটা অন্যভাবেই করি। করি, আপনার চোখের দোষ সারাবার এক জোড়া চশমা বানিয়ে দিয়ে।

সে চশমায় চোখের দোষ যদি না সারে?—চিং স্নুনের মিথ্যে বড়াই থামাবার জন্যেই বললাম।

চিং স্নুন কিন্তু ভড়কালেন না। একটু যেন ভেবে নিয়ে বললেন, —না যদি সারে তাহলে দু-দুটো সাগর-ভোঁদড়ের লোমওয়ালা চামড়া জরিমানা দেব। আপনার বন্ধু লি পো আমার সে চামড়া দেখেছে। সে দুটো লি পোর কাছে আজই জামিন রেখে যাচ্ছি।

সাগর-ভোঁদড়ের চামড়া!—মুখে কিছু বুঝতে না দিলেও মনে মনে তখন রীতিমত অবাক্ হয়েছি। তবু বাইরে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললাম,—চামড়া আসল না নকল?

আসল কি নকল ও জিনিসের জহুরী হলেই বুঝবেন।—চিং সুন চটপট জবাব দিলেন,—আজই ত সে দুটো এনে জামিন রাখছি।

সেদিন বিকেলে সত্যিই চিং সুন যে দুটি সাগর-ভোঁদড়ের ফ্যর নিয়ে এলেন তা দেখে চোখের পলক আর যেন পড়তে চায় না। আসল সাগর-ভোঁদড়ের লোমওয়ালা চামড়া—মখমল আর সাটিন তার কাছে কোমলতা আর উজ্জ্বলতায় লজ্জা পায়।

এ ফ্যর আপনি পেলেন কোথায়?—না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

এ আমাদের পরিবারেরই পুরানো সম্পদ।—বললেন চিং সুন, —চৌদ্দ পুরুষ ধরে আমরা চীনের মান্দারিন ছিলাম। মান্দারিনদের নেশা আর বড়াই ছিল এই সাগর-ভোঁদড়ের ফ্যর সংগ্রহ করা। দুনিয়ার সবচেয়ে চড়া দাম তাঁরাই দিতেন এ-জিনিসের। আমাদের পরিবারে এ জিনিস আরো অনেক ছিল। আমি শুধু দুটি মাত্র নিয়ে আসতে পেরেছি। এখন বলুন, এই জামিনই যথেষ্ট কি?

হ্যাঁ যথেষ্ট নয়, আশাতীত।—এবার হেসে বলতেই হল,—কিন্তু নেহাত নিঃস্বার্থভাবে আমার চশমা তৈরীর এতখানি ঝুঁকি নিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না।

না, স্বার্থ একটু আছে বইকি!—চিং সুন স্বীকার করলেন হেসে,—আমার চশমায় যদি আপনার চোখের দোষ সত্যি সারে, তাহলে আপনাকেও একটা কথা রাখতে হবে আমার।

কী কথা?—সন্দিগ্ধ হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

—এমন কিছু নয়, আমাকে জ্যান্ত সাগর-ভোঁদড় দেখাতে হবে আপনাকে।

জ্যান্ত সাগর-ভোঁদড় দেখার আমি!—আমি চোখ কপালে

তুলে বললাম,—এরকম আজগুবী আবদারের কোন মানে হয়? আঠারো শ' ত্রিশ সালের পর জ্যান্ত সাগর-ভোঁদড় পৃথিবীর কেউ দেখে নি।

কেই দেখে নি বলেই ত আপনার কাছে এসেছি?—চিং সুন খোলাখুলিভাবে বলে ফেললেন,—ধাপ্পা দেবার ছলে আপনার সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করেছি কি মিছিমিছি? আপনার অনেক খবরই জেনেছি মিঃ দাস। আর বছরে ক্যালিফোর্নিয়ার সান পাব্‌লো উপসাগরে আপনি মাঝারি তিমি শিকারের নামে ছোট একটা স্লুপ নিয়ে কয়েক মাস ঘুরেছেন, অথচ একটাও তিমি ধরেন নি। সমুদ্রের ও অঞ্চলে আপনি শখ করে হাওয়া খেতে গেছলেন বলে ত মনে হয় না!

হাওয়া খেতে যাইনি বলেই সাগর-ভোঁদড়ের সন্ধান পেয়েছি এ কথা প্রমাণ হয় কি?—বিদ্রূপের সুরেই বললাম,—আমি ওখানে রত্নদ্বীপের মূল চেহারা দেখতে গেছলাম!

রত্নদ্বীপের মূল চেহারা!—চিং সুন একটু ভ্যাবাচাকা,—সে আবার কী? ওখানে রত্নদ্বীপ আবার কোথায়?

সত্যিকার নয়, কল্পনার রত্নদ্বীপ।—চিং সুনকে এবার বোঝালাম,—আপনি ত ডাক্তারি ছাড়া অনেক কিছু নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন মনে হচ্ছে। আর, এল স্টীভেন্‌সনের নাম শুনেছেন আশা করি?

হ্যাঁ শুনেছি।—চিং সুন তখনো বেশ ধাঁধার মধ্যে,—সেই বিখ্যাত লেখক ত যিনি 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' লিখেছিলেন?

তাঁর সেই ট্রেজার আইল্যাণ্ড মানে কল্পনার রত্নদ্বীপের কথাই বলছি।—চিং সুনকে গম্ভীর হয়ে বললাম।—স্টিভেন্‌সন্ আঠারো শো উনআশি খ্রীষ্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে একটি জায়গায় কিছুদিন কাটান। স্পেনের নাবিকরা সে উপকূলের নাম দিয়েছিলেন প্যাণ্টা দে লস লোবোস ম্যারিনোজ অর্থাৎ সাগর-নেকড়ের স্থল-বিন্দু।

ট্রেজার আইল্যাণ্ডে যে দ্বীপের বর্ণনা তিনি করেছেন, তার আদল ওইখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকেই নেওয়া। আমি সেই জায়গাই দেখতে গেছলাম। কিন্তু সেখানে ত দু'-জাতের সীল শুধু পাওয়া যায়, স্প্যানিয়ার্ডরা যার নাম দিয়েছিল সাগড়-নেকড়ে।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই মিঃ দাস।—এবার চিং সুন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন,—আপনি আমার শর্তে চশমা নিতে রাজী কিনা, তাই শুধু বলুন? চশমা ঠিক হলে সাগর-ভোঁদড় আমায় দেখাবেন কি না?

চশমা ঠিক না হলে সাগর-ভোঁদড় ত দেখতেই পাব না।—এবার হেসে বললাম,—আর দেখতে যদি পাই তাহলে আপনাকেই বা সে দৃশ্যে বঞ্চিত করব কেন? কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি। সাগর-ভোঁদড়ের সন্ধান যদি পাই ত শুধু চোখেই দেখবেন, ধরবার নামও করবেন না। এই বিরল প্রাণীর শেষ যে কটি প্রতিনিধি এখনো মানুষের চোখের আড়ালে লুকিয়ে টিকে আছে, তাদের মানুষের লোভের কাছে বলি দেওয়ার পাপের ভাগী আমি হব না কিছুতেই।

আমিই কি তা হতে চাই!—চিং সুন প্রায় শিউরে উঠে বললেন,—আমার শুধু একবার চোখে দেখার সাধ। ছেলেবেলা থেকে এই প্রাণীটি দেখবার জন্যে আমি লালায়িত। আপনার কাছে এবার তাহলে স্বীকার করি সত্য কথাটা। এই সাগর-ভোঁদড় খোঁজবার জন্যে আমি নিজে একটা স্লুপ পর্যন্ত কিনে ফেলেছি। সেই স্লুপ নিয়ে গত কয়েক বছর চষেও বেড়িয়েছি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আলাস্কা পর্যন্ত ওই উপকূলের সমুদ্র। লাভ কিছু অবশ্য হয় নি, তবে আপনার খোঁজ খবরাখবর ওই স্লুপ নিয়ে ঘোরাঘুরির সময়েই পাই। আপনাকে কথা দিচ্ছি সাগর-ভোঁদড় যদি দেখান ত ক্যামেরায় ছাড়া আর কিছুতে ধরব না।

চিং সুন যে কত বড় কপট শয়তান তা যখন ধরতে পারলাম, তখন

আমি নিরুপায়ভাবে তারই হাতের মুঠোয়। তার আগে হাতুড়ে হোক বা না-হোক, তার দেওয়া চশমায় সত্যি আমি টাইওয়ানেই নতুন চোখ পেয়েছি। নিজের কড়ার রাখতে তারই সঙ্গে তারপর এসেছি সানফ্রানসিস্‌কোয়। সেখানে তার সুলুপে উঠে ভোঁদড়ের খোঁজে রওনা হবার সময়েই মনে অবশ্য একটু খটকা লেগেছিল। সুলুপের মাঝি-মাল্লা সব চীনে। চেহারাগুলো কেমন দুশমনের মত। সে খটকাকে তবু আমল দিই নি। মাঝি-মাল্লার চেহারা নিরীহ ভালোমানুষের মত হবে কেন এই কথাই নিজেকে বুঝিয়েছি। চিং সুনও অবশ্য তাঁর অমায়িক ব্যবহারে সব ভুলিয়ে দিয়েছেন। আমি যেন তাঁর গুরুঠাকুর এমনি তদ্‌বির করেছেন আমার। কদিন উত্তরমুখো পাড়ি দিয়ে তারপর এক জায়গায় এসে সুলুপের নোঙর ফেলতে নির্দেশ দিয়েছি সন্ধ্যাবেলা। সেটা মন্টেরয় উপ-দ্বীপের কূল। সেখানেই কদিন কাছাকাছি সুলুপ নিয়ে ঘোরাঘুরির পর একদিন সকালে সাগর-ভোঁদড়ের দেখা পেলাম। সেদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে চশমাটা প্রথমে খুঁজে পাই নি। সত্যিই চশমাটা তখন হারালে সাগর-ভোঁদড়ও খুঁজে পেতাম না, আর চিরকাল মনের মধ্যে এতবড় একটা আফসোসও পুষে রাখতে হত না।

ঘনাদা যেন সেই পুরনো আফসোসেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন।

সাগর-ভোঁদড়ের দেখা পেয়েও আফসোস কেন ঘনাদা?—আমাদের একটু উসকে দিতে হল,—চিং সুন বেইমানি করলে বুঝি?

বেইমানি শুধু নয়, শয়তানি!—ঘনাদা সে কথা স্মরণ করেই যেন উত্তেজিত,—চশমা খানিক বাদে বাক্সের তলাতেই খুঁজে পেলাম। সে চশমা পরে ডেকে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আশাতীত দৃশ্য দেখতে পেলাম। গোটা কুড়ি সাগর-ভোঁদড়ের ছোট একটা পাল। তীর থেকে কয়েক শ গজ দূরে সমুদ্রের জলের ওপর একটা ডুবো পাহাড় খানিকটা মাথা তুলে জেগে আছে, তার চারধারে কেল্প

মানে বাদামী রঙের বড় বড় সামুদ্রিক আগাছার আধডোবা জঙ্গলে ভোঁদড়ের পাল রঙে রং মিলিয়ে প্রায় অদৃশ্য হয়েই চরে বেড়াচ্ছে।

আনন্দে উত্তেজনায় প্রায় চিৎকার করেই ডাকলাম,—চিং সুন!

চিং সুন কাছেই ছিলেন। ছুটে এসে অস্থির ভাবে বললেন,—কী! কোথায়?

দেখতে পচ্ছেন না?—নিজেকে সামলে শান্ত গলাতেই বললাম।

কী দেখতে পাব! সাগর-ভোঁদড়? কোথায়?—চিং সুনের গলায় সন্দেহ ও বিরক্তি।

চিং সুনকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সমুদ্রের নোনা জলের ঢেউয়ের শ্যাওলা-ধরা পাহাড়ের গা আর বাদামী কেল্পের জঙ্গলের মধ্যে মিশে-থাকা সাগর-ভোঁদড় চিনে নেওয়া অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও বহু সাধনায় তৈরি করা পাকা চোখ না হলে অসম্ভব। চশমাটা না থাকলে পাকা চোখ নিয়েও আমি পারতাম না।

ধৈর্য ধরে চিং সুনকে এবার জায়গাটার আরো স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে সাগর-ভোঁদড়গুলোকে দেখিয়ে দিলাম।

চিং সুনের নাচানাচি তখন দেখবার মত। তাঁর সে ছেলেমানুষি সত্যি ভালোই লাগল।

ক্যামেরা! ক্যামেরা!—বলে তিনি তখন হাঁকাহাঁকি করছেন।

হেসে বললাম,—আপনি ক্যামেরা নিয়ে যত খুশি ছবি তুলুন আজ, কিন্তু মনে রাখবেন কাল আমাদের ফিরতেই হবে। আপনার সারা জীবনের সাধ যখন মিটেছে, তখন আর দেরি করবার কারণও নেই।

নিশ্চয়, নিশ্চয়! চিং সুন হাসিমুখে আশ্বাস দেবার পর নিজের মুভি ক্যামেরাটাও আনতে কেবিনে গেলাম। ক্যামেরাটা বার করতে যাচ্ছি বাক্স থেকে, হঠাৎ ঘরটা একটু অন্ধকার হওয়ায়

চমকে তাকিয়ে দেখি সুলুপের দুশমন চেহারার চীনে মাল্লাদের একজন কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে!

কেমন একটু সন্দেহ হওয়ায় উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে তাতে চাবি লাগাবার শব্দও পেলাম।

ব্যাপারটা বুঝতে আর দেরি হল না। চিং সুনের এরকম শয়তানির সম্ভাবনা যে একেবারে মাথায় আসে নি, তার জন্যে নিজেকে তখন ধিক্কার দিয়ে আর লাভ কি।

ব্যাকুলভাবে কেবিন ট্রাঙ্কটা হাতড়ে পিস্তলটা খুঁজলাম। পিস্তল সেখানে নেই। তা যে পাব না আগেই বোঝা উচিত ছিল। চিং সুন আটঘাট না বেঁধে তার এ শয়তানি ফন্দি আঁটে নি। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত নিষ্ফল আক্রোশে গজরানো ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তবু ট্রাঙ্কটা হাতড়ে একটা কাজের জিনিস যে পেলাম এই ভাগ্য।

দুপুর পর্যন্ত সেইভাবেই কাটল। বাইরে থেকে সুলুপের ওপরকার যে সব আওয়াজ কানে আসছিল, তার মানে বুঝে শরীরের রক্ত তখন ফুটছে। স্বয়ং চিং সুন-ই এসে বেলা বারোটা নাগাদ আমার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে অবশ্য চকচকে ছুরি হাতে একজন চীনে মাল্লা।

চিং সুনের হাঁড়ি-মুখের দু-পাটি দাঁতই তখন অমায়িক হাসিতে আকর্ণবিস্তৃত হয়ে বেরিয়ে আছে।

যেন লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে তিনি বললেন,—ছি! ছি! কী অন্যায় বলুন ত! কে হতভাগা এক মাল্লা আমার হুকুম না বুঝে আপনাকে এতক্ষণ কেবিনে বন্ধ করে রেখেছে! আমি কোথায় ক্যামেরার কাজ দেখাতে আপনাকে ডেকে আনতে বললাম, আর গাড়োলটা কিনা আপনার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেল!

তাতে আর কী হয়েছে!—আমিও তাঁর বিনয়ে যেন গলে

গিয়ে বলমাম,—কেবিনে খানিকক্ষণ তবু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করা গেল। আপনার ক্যামেরার কাজ নির্বিঘ্নে সারা হয়েছে নিশ্চয় ?

তা কতকটা হয়েছে আপনার আশীর্বাদে।—চিং সুন সকৃতজ্ঞ-ভাবে হেসে বললেন,—আপনাকে তাই দেখাবার জন্যেই ত ডাকতে এসেছি। আসুন, আসুন।

সামনে চিং সুন আর পেছনে ছুরি হাতে সেই মাল্লার মাঝখানে ডেক পর্যন্ত যেতে হল।

ডেকে গিয়ে পৌঁছোবার পরই রক্তটা মাথায় উঠে গেল এক মুহূর্তে। গোটা আষ্টেক সাগর-ভোঁদড় সেখানে ডেকের পাটাতনের ওপর পড়ে আছে। প্রায় সব কটাই মরা। একটা-দুটোর উজ্জ্বল মোলায়েম গা শুধু তখনো মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সুলুপের ধারে আমায় যেখানে দাঁড় করিয়েছে, তার পেছনেই বিরাট জালটা জল থেকে তোলা হলেও তখনও ফ্রেমে টাঙানো।

চোখে যে তখন চারিদিক লাল দেখছি তা বুঝতে না দিয়ে মুখে হাসি টেনে গদগদ হয়ে বললাম,—বাঃ চমৎকার ক্যামেরার কাজ ত! চীনে ভাষাটা কিছু জানি বলে অহংকার ছিল। এখন দেখছি অনেক কিছুই আমার শিখতে বাকী। আপনার চীনে ভাষায় অন্ততঃ ক্যামেরা মানে ভোঁদড়-ধরা জাল, কেমন ?

ঠিক ধরেছেন!—চিং সুন আমার বাহাদুরিতে যেন অবাক্।

—আর কৃতজ্ঞতা মানে বেইমানি, সামনে হাত বাড়িয়ে বন্ধুত্ব মানে পিঠে চোরাগোপ্তা, আর মানুষের চেহারা মানে শয়তানের মুখোশ!

চিং সুনের চালকুমড়ো মুখের টেরা চোখদুটো তখন তার মাল্লার হাতের ছুরির মতই চক্‌চক্ করছে।

মুখে কিন্তু মোলায়েম হাসিটি বজায় রেখে তিনি বললেন,—আমাদের ভাষাটা এত তাড়াতাড়ি রপ্ত করেছেন দেখে আপনার মাথাটাই যে বাঁধিয়ে রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু হাতে আমার

সময় বড় কম। সাগর-ভোঁদড়ের খবর জানাজানি হয়ে যাবার আগেই এ তল্লাটের যতদূর সম্ভব সব ভোঁদড় সাবাড় করে দেশে ফিরে যেতে হবে। তাই অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লোহার শেকলে হাত-পা বেঁধে আপনাকে এইখানেই সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে যেতে হচ্ছে। একটা ভরসা আপনাকে দিচ্ছি। এখানে হাঙর-টাঙরের উৎপাত নেই বললেই হয়। সুতরাং সমুদ্রের তলায় শুধু মাছেরাই আপনার হাড়মাস খুবলে খাবে!

ভরসাটুকুর জন্যে ধন্যবাদ, চিং সুন!—যেন কৃতার্থ হয়ে বললাম,—কিন্তু এখনকার সাগর-ভোঁদড় সাবাড় করে নিয়ে যাওয়া বোধ হয় আপনার ভাগ্যে নেই। আপনার শয়তানিটা আঁচ করতে পারি নি সত্যি, কিন্তু সাগর-ভোঁদড় যে এখনো টিকে আছে আর এতদিন মানুষের চোখ এড়িয়ে থাকার দরুন কিছু বংশবৃদ্ধি যে করতে পেরেছে, এ খবর আর বেশীদিন চাপা থাকবে না বুঝে সানফ্রানসিস্‌কোতে নেমেই আমার বন্ধু সামুদ্রিক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডক্‌টর ক্যামেরনের সঙ্গে দেখা করে এসেছি। কি তাঁকে করতে হবে, তাও বলে এসেছি সব। এখান থেকে কিছু দূরে বিক্‌স্‌বি ক্রীকের মুখে তিনি তাঁর লোকজন নিয়ে তখন থেকেই পাহারায় আছেন। ইতিমধ্যে সাগর-ভোঁদড়ের একটা-দুটো পাল দেখেও ফেলেছেন বলে বিশ্বাস করি। এ পাল দেখবার পরেই ক্যালিফোর্নিয়া ও আমেরিকার ফেডারেল সরকারকে জানিয়ে এ প্রাণীটিকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা যা করবার তিনি হয়ত করেই ফেলেছেন ইতিমধ্যে। সুতরাং আপনার শয়তানি মতলব সিদ্ধ হবার কোন আশাই ত দেখছি না।

চিং সুনের মাংসের পাহাড় আমার এই কথার মধ্যেই প্রায় আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠল! মুখ থেকে যেন আগুনের হলকা বার করে চিং সুন বললেন,—হতভাগা কেলে আরশোলা! তুই লুকিয়ে লুকিয়ে এই চালাকি করেছিস! তোকে আমি নিজের হাতেই আরশোলার মত আজ টিপে মারব।

আমার ওপর ধস-নামা পাহাড়ের চূড়োর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে চিং সুন আমার গলাটা টিপে ধরলেন।

ছুরি হাতে মাল্লাটা আচমকা সেই দশমনি লাশের ভার সইতে পারবে কেন? চিং সুন সচাপ্টে তার ওপর গিয়ে পড়বার পর দুজনে জড়াজড়ি করে ডেকের ওপর পড়ল লুটিয়ে। ছোরাটা তখন ঝনঝনিয়ে ছিটকে চলে গেছে ডেকের রেলিং-এর ধারে।

সেটা কুড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে, টাঙানো জালটার ফ্রেমের মাথাতেই উঠতে হল। ছোরাটা জালের মধ্যে গলিয়ে তারই বাঁট ধরে ঝুলে পড়লাম এবার। ধারালো ছোরায় জালটা ফর্দা ফাঁই ক'রে কেটে একেবারে সমুদ্রের জলেই গিয়ে পড়লাম ঝাঁপিয়ে! সেখানে থেকে ডুব-সাঁতারে সুলুপের হালের কাছে।

ওপরে ভ্যাবাচাকা খাওয়া মাঝি-মাল্লারা তখন সামলে উঠে হৈ চৈ শুরু করেছে। সুলুপের দু-ধারের রেলিং থেকে ঝুঁকে চেষ্টাও করছে আমায় খোঁজবার।

ছোরাটা সত্যিই যেমন ধারালো তেমনি মজবুত। কখনো স্ক্রু ড্রাইভার, কখনো বাটালির মত সেটা কাজে লাগিয়ে কয়েকটা ইস্ক্রুপ নাট বল্টু খুলে হালটাকে অকেজো করে দিতে বেশীক্ষণ লাগল না। এবার অন্য কাজটাও সারলাম। আবার ডুব-সাঁতার দিয়ে তারপর সাগর-ভোঁদড়দের আস্তানা সেই ডুবো পাহাড়ের জাগা চূড়োর ধারেই গিয়ে উঠলাম। তার একটা খাঁজের আড়াল থেকে সুলুপটার ওপর নজর রাখা সোজা।

খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। আমায় খুঁজতে সুলুপ ঘোরাতে যেতেই হালের অবস্থাটা ধরা পড়ল। তা নিয়ে চেঁচামেচি হাঁকাহাঁকি খানিক হতে না হতেই সুলুপের ওপরে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড। সুলুপের গ্যাফটপ পালে আগুন লেগে গেছে। তার সব ঝুলোনো দড়ি-দড়া থেকে ধোঁয়ার রাশ উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

হাল বিকল করবার পর তাই বেয়ে একটু উঠে এই কাজই

সেরেছিলাম। পালের ঝোলানো কটা দড়ি-দড়ায় লাইটার থেকে একটু করে পেট্রোল লাগিয়ে ধরিয়ে দিয়েছিলাম আগুন। কেবিনে বন্দী অবস্থায় পিস্তলটা না পেলেও এই লাইটারটিই কেবিন ট্রাঙ্কের মধ্যে পাই। বিশেষ কিছু না ভেবেই সেটা পকেটে রেখেছিলাম। সেটা যে এমন কাজে লাগবে তখনও ভাবে পারি নি।

চিং সুন আর তার দুশমন মাঝি-মাল্লারা তাদের বেহাল জ্বলন্ত স্লুপ নিয়ে কী তারপর করেছে ঠিক জানি না। যাই করুক তাদের ভোঁদড় শিকারের আশায় যে চিরকালের মত ছাই পড়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার তখন আসল জরুরী খবরের জন্যই বেশী আগ্রহ। স্লুপের ওই অবস্থা দেখেই আমি তাই সাঁতরে তীরে গিয়ে উঠি। সেখান থেকে সোজা সানফ্রানসিস্‌কোতে ডক্‌টর ক্যামেরনের কাছে।

ডক্‌টর ক্যামরেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই অবশ্য সেদিনে খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সংবাদটা পেলাম। একেবারে প্রথম পাতাতেই দু-কলম শিরোনাম দিয়ে খবরটা ছাপানো।—এক'শ বছর বাদে বিলুপ্ত সাগর-ভোঁদড়ের খোঁজ। বিরল প্রাণীটির বংশরক্ষায় সরকারী সংরক্ষণ আইন প্রয়োগ।

নিজের অজান্তে যে অন্যায়ের সহায় হয়েছি, তার জন্যে মনে মনে আফসোস থাকলেও ওইটুকু সান্ত্বনা মনের মধ্যে নিয়ে ফিরেছি যে, পৃথিবীর এই একটি অমূল্য প্রাণী অন্ততঃ মানুষের নির্মমতায় আর লোপ পাবে না।

ঘনাদা চুপ করলেন। মুখে যেটা ফোটাবার চেষ্টা করলেন সেটা নিঃস্বার্থ কর্মবীরের অনাসক্তিই বোধ হয়। শিশিরের সিগারেটের টিনটা কিন্তু তখন তাঁর কোলের কাছ থেকে ফতুয়ার পকেটে ঢুকেছে।

সেই পকেট থেকেই যেন হঠাৎ হাতে ঠেকায় আমাদের সেই খামটি বার করে তিনি খানিকক্ষণ সেটা উল্টে-পাল্টে দেখে বেশ অবাক্।

এই বোধহয় তোমাদের সেই চিঠি!—ঘনাদা বেশ মনমরা ভাবেই বললেন সেটা শিশিরের হাতেই এগিয়ে দিয়ে,—চশমা ছাড়া ত আর পড়তে পারব না। ওটা নিয়েই যাও তোমরা।

চিঠি নিয়ে আর আমাদের মাথা তোলবার অবস্থা নেই। সুড়সুড় করে বিনা বাক্যব্যয়ে সবাই নীচে নেমে এলাম।

নেমে এসেই আমাদের আহাম্মকির প্রমাণস্বরূপ চিঠিটা যখন কুচি কুচি করে ছিঁড়ছি, তখন গৌরকে ডিক্‌শনারি পেড়ে নিয়ে বসতে দেখে আমরা অবাক্।

কী, ব্যাপার কি?—জিজ্ঞাসা করলাম,—লিপিতত্ত্বে হার মেনে আবার শব্দতত্ত্ব কেন?

এই যে বলছি।—গৌর অভিধানের পাতা উলটে বললে,—ঘনাদার চোখের রোগগুলো মনে আছে? প্রেসবাইওপিয়া আর ডাইক্রোম্যাটিক ভিসন। ওগুলোর মানে শুনবে? প্রেসবাইওপিয়া হল চালশে আর ডাইক্রোম্যাটিক দৃষ্টি বলে রং-কানাদের!

আমাদের হাঁ-করা মুখের ওপর গৌর ডিক্‌শনারিটা বন্ধ করল।

ছাতা

বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের এমন দুর্দিন বুঝি আগে কখনও আসে নি।

কি হয়েছে? কারুর অসুখ-বিসুখ?

বালাই ষাট! বাহাত্তর নম্বরে ও-সব জ্বালা নেই! শত্তুরেরও ও-সব যেন না হয়।

তাহলে কি অবস্থা খারাপ? চাকরি-বাকরি সব গেছে? মেস চলছে না?

উঁহু, সে-সব কিছু নয়। ভালোমন্দ পাঁচজনের শুভেচ্ছায় হিংসেয় মেসের লক্ষ্মী আমাদের অচলা।

তবে হয়েছেটা কি, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলতে হয়, হয়েছে আমাদের আহাম্মকীর সাজা!

তাতেও না বুঝলে, আর একটু ব্যাখ্যা করে হিতোপদেশের গল্প বলতে হয়।

সেই যে, কে যেন, কোথায়, কাকে যেন কখন, কিভাবে কেমন করে···

যাক্ গে। সে গল্প ত সকলেই জানে। সুতরাং দুবার করে বলার মানে হয় না।

আমাদের দুঃখের কথাই বলি।

সাত নম্বর সীট ভর্তি হওয়া থেকেই আমাদের দুঃসময় শুরু। কি কুক্ষণে যে ওই সীটে নতুন বোর্ডার নেবার কুমতি হয়েছিল!

সাত নম্বর সীট ছিল সেই বিখ্যাত বাপী দত্তের ; আমাদের মাস কয়েক যে বিস্‌ড়ি হাঁসে অরুচি ধরিয়ে শেষে নিজেই বিগড়ে জন্মের মত মেস ছেড়ে গেছে। বাপী দত্ত আমাদের বাংলা ভাষায় অনেকগুলো নতুন নতুন গালমন্দ শাপমন্যির শব্দ শিখিয়ে চলে যাবার পর ও-সীটটা খালিই পড়েছিল অনেকদিন। ভেবেছিলাম যেমন আছে, থাক। বাইরের কাউকে আর আমাদের মধ্যে ঢোকাবো না।

কিন্তু নিজেদের কপাল দোষে সেই আহাম্মকীই করে ফেললাম।

যাকে-তাকে হট্ করে ঢুকতে দিই নি। বলতে গেলে বেশ দেখেশুনে বাজিয়েই বোর্ডার নিয়েছিলাম। বাপী দত্তের মত গোঁয়ার-গোবিন্দ নয়। চেহারায় কথাবার্তায় বেশ নিরীহ ভালোমানুষই মনে হয়েছিল। নামেও যেমন, ব্যবহারেও তেমনি সুশীল ভেবেছিলাম।

কিন্তু সেই কেঁচোই যে কেউটে হয়ে দাঁড়াবে কে জানত!

প্রথম কয়েকটা দিন সুশীলের স্বরূপ বুঝতে পারি নি। রোগাপটকা ছোট্টখাট মানুষ, চোখের ঠুলির মত মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটাই যা নজরে পড়ে। সারাক্ষণ মুখ বুজেই থাকে। বিশেষ কারুর সঙ্গে আলাপ-টালাপের চেষ্টা করে না। আমরা সুশীল চাকীকে গ্রাহ্যের মধ্যেই ধরিনি তাই।

ক'দিন বাদে প্রথম কুটুস্-কামড়টিতেই তাই হকচকিয়ে গেলাম।

সেদিনও শনিবারের সকাল। ঘনাদা আমাদের সঙ্গেই কৃপা করে খাবারঘরে খেতে বসেছেন। আমাদের ঠাকুর রামভুজ যথারীতি রুই মাছের কালিয়ার জামবাটিটা তাঁর পাতের কাছেই নামিয়ে দিচ্ছে এমন সময় খুক খুক হাসির শব্দে চমকে উঠলাম।

হাসে কে?

হপ্তার আর পাঁচদিন যাই করি, শনি-রবিবারে ঘনাদার কোন ব্যাপারে হাসা ত কুষ্টিতে লেখে নি। হাসির বদলে নেহাত নিরুপায় হলে কাশি একটু-আধটু শোনা যায় বটে!

সন্ত্রস্ত হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। এমন বেয়াক্কিলে বেয়াদবি কার পক্ষে করা সম্ভব?

ঘনাদার কালিয়ার বাটিও তখন একটুখানি কাৎ হয়ে থমকে গিয়েছে। আমাদের মুখগুলোর ওপর তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন সার্চলাইট বুলিয়ে গেল।

সে সার্চলাইট যেখানে গিয়ে থামল, আমাদের সকলের চোখ সেখানে পৌঁছে একসঙ্গে ছানাবড়া। শ্রীমান সুশীল থালার উপর মাথা নীচু করে নিবিষ্ট মনে খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার এঁটো ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসির ঝিলিক তখনও মেলায় নি!

যাকে বলা যায় সঙ্কটজনক মুহূর্ত। আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা বরছি কি হয় কি হয় ভেবে।

ফাঁড়াটা সে-যাত্রা অবশ্য কেটে গেল। ঘনাদা একটা নাসিকাধ্বনি করে তাঁর জামবাটিতে মনোযোগ দিলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ব্যাপারটা ওইখানেই চুকে গেলে ভাবনার কিছু ছিল না, কিন্তু সুশীল চাকীকে তখনও আমাদের চিনতে বাকি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে সবাই উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ছাদের কড়িকাঠগুলোকেই যেন উদ্দেশ করে সে বললে,—আমার কাছে ভালো চূরণ আছে। একেবারে লকড়ি হজম, পথর হজম। কারুর দরকার হলে দিতে পারি।

দরকার কারুর অবশ্য হল না, কিন্তু তাঁর তেতালার ঘরে উঠবার সিঁড়িতে ঘনাদার বিদ্যাসাগরী চটির যেরকম আওয়াজ শুনলাম, তাতেই বোঝা গেল আমাদের শনি-রবির আসরের দফা রফা!

শুধু সেই শনি-রবিই নয়, সেই থেকে সব ক'টি ছুটির দিনই আমাদের মাঠে মারা যাচ্ছে।

তোড়জোড় করে ঘনাদাকে তাঁর মৌরসী আরাম-কেদারায় যদি বা কোনদিন এনে বসাই, শিশিরের সাগ্রহে ধরিয়ে দেওয়া সিগারেটের দুটো টান দিয়েই তিনি উঠে পড়েন।

কারণটা পিছন ফিরেই দেখতে পাই। শ্রীমান সুশীল চাকী ঠোঁটের সেই বাঁকা হাসিটি নিয়ে আমাদের আড্ডা-ঘরে ঢুকছে।

উঠছেন কেন ঘনাদা ?—আমাদের কারুর না কারুর গলা থেকে আর্তনাদ বেরোয়।

ঘনাদার হয়ে সুশীল চাকীই মিছরির ছুরির মত গলায় জবাব দেয়,—আলজিরিয়া কি আইসল্যাণ্ড যেতে হবে বোধ হয়।

আমরা বোবা হয়ে যাই রাগে দুঃখে মনের জ্বালায়।

ঘনাদা সুশীলের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে সোজা তাঁর তেতালার ঘরে গিয়ে ওঠেন।

এরপর তাঁর ধারে কাছে ঘেঁসে কার এত বড় বুকের পাটা!

এমনি করেই দিন যাচ্ছে। সুশীল চাকী যেন সত্যিকার শনি হয়েই বাহাত্তর নম্বরে ঢুকেছে। সে এ মেসে থাকতে ঘনাদাকে নিয়ে জমিয়ে বসবার আর কোন আশা নেই।

শনিই হোক আর যাই হোক, নিজে থেকে মেস না ছাড়লে মেরে ধরে' ত আর তাড়ানো যায় না! আমরা তাই হাল ছেড়ে দিয়ে মেস তুলে দেব কিনা তাই ভাবতে শুরু করেছি।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এই রকম মনমরা হয়েই আড্ডা-ঘরে নেহাত আর কিছু করবার নেই বলে লুডো খেলতে বসেছিলাম। লুডো অবশ্য নামে। কার পাকা ঘুঁটিকে কেটে দিল তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই।

আসলে আমাদের মন পড়ে আছে তেতালার সিঁড়িতে। হতভাগা সুশীল চাকী এখনো মূর্তিমান অভিশাপের মত দেখা দেয় নি। ঘনাদাও নামেন নি তাঁর তেতালার টঙ থেকে।

সারাদিন কখনো ঝিরঝির, কখনো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এমন একটা অপরূপ বাদলার সন্ধ্যায় সুশীল চাকী যদি বাইরে কোথাও ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে আটকে পড়ে, আর ঘনাদা যদি দৈবাৎ নেমে আসেন এই ক্ষীণ দুরাশায় এক ধামা মসলা-মুড়ি টেবিলের ওপর ধরে রেখেও আমরা লোভ সামলে আছি।

মনে মনে সবারই এক চিন্তা।

গৌরই মুখ ফুটে সেটা প্রকাশ করে ফেললে,—বৃষ্টিটা খুব জোরে পড়ছে কি বলিস? নির্ঘাৎ রাস্তাঘাটে জল দাঁড়িয়েছে!

হ্যাঁ, ট্রাম-বাস কিছুই চলছে না।—শিশির দু ছক্কা পঞ্জা ফেলেও আমার দু-দুটো কাটবার ঘুঁটিকে অকাতরে রেহাই দিয়ে বললে, —একবার বাইরে বেরুলে এখন আর ফেরা অসম্ভব।

শিবু নিজের দান ফেলে গৌরেরই একটা ঘুঁটি চেলে দিয়ে বললে,—সুশীল চাকী তখন বেরিয়ে গেল না ছাতা নিয়ে?

এ-কথার উত্তর না দিয়ে সবাই তখন আমরা কান খাড়া করে ফেলেছি। ঘনাদার চটির আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে না সিঁড়িতে?

হ্যাঁ, ঘনাদাই ত নামছেন?

চট্ করে মসলা-মুড়ি এক এক মুঠো মুখে দিয়ে আমরা লুডোয় যেন তন্ময় হয়ে গেলাম।

কিন্তু ঘনাদার পায়ের আওয়াজ নিচে পর্যন্ত নামবার আগেই মসলা-মুড়ির গ্রাস আমাদের গলায় যেন আটকে গেল। ঘনাদার আগেই ভিজে ছাতাটা বারান্দায় শুকোতে দিয়ে ঘরে ঢুকল স্বয়ং সুশীল চাকী।

সেই বাঁকা হাসি নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পরমানন্দে মুড়ির ধামায় হাত ডুবিয়ে বললে,—আরে ছোঃ! লুডো খেলছেন আপনারা! এ ত নাবালকের খেলা! গোঁফ কামাবার পর কেউ এ খেলা খেলে!

ভিজে বেড়ালের মত যে এ মেসে ঢুকেছিল, সেই মুখচোরা সুশীল চাকী যে এক মাসেই মুখফোড় মাতব্বর হয়ে উঠেছে তা বোধ হয় আর বলে বোঝাতে হবে না।

খেলায় যেন তন্ময় হয়ে আমরা তার কথাটা গায়েই মাখলাম না। লুডোর ছকের ওপর ঝুঁকে পড়েও আমরা তখন কান রেখেছি সেই বাইরে। ঘনাদা নামতে নামতে থামলেন টের পেলাম।

তারপর আমাদের সব আশা চুরমার করে তাঁর পায়ের শব্দ নিচে নেমে মিলিয়ে গেল।

সুশীল চাকীকে এরপর যদি আমরা চাঁদা করে চাঁটি লাগাতাম খুব অন্যায় হত কি?

কিন্তু তা আর পারলাম কই? তার বদলে মুড়ির ধামাতেই হাত লাগাতে হল। সুশীল যে রেটে হাত আর মুখ চালাচ্ছে, তাতে আমাদের সাহায্য ছাড়াই ধামা খালি হয়ে এল বলে।

তুচ্ছ মুড়ি-মসলার প্রতি আমাদের হঠাৎ এই উৎসাহে সুশীল কিন্তু বেশ একটু ক্ষুণ্ণ। বললে,—খেলা ছেড়ে দিলেন যে!

আপনি বসে থাকবেন আর আমরা খেলতে পারি!—হাতে এক মুঠো আর গালে এক গ্রাস নিয়ে কোন রকমে জানালাম।

শূন্যপ্রায় ধামাটা আমাদের চারজনের হাতের নাগাল থেকে চট্ করে সরিয়ে নিয়ে সুশীল বললে,—কেন পারেন না! আমি ত খেলি না। শুধু দেখি!

ওঃ, দেখেন! খেলা শুধু দেখেন আর মসলা-মুড়ি সামনে থাকলে খান!—শিশিরের কথাগুলো দাঁতে দাঁতে চিপ্‌টে যেন চাবুক হয়ে বেরুল।

সুশীল চাকীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

খাওয়া আর হল কই! ধামাটা উবুড় করে তবু অম্লানবদনে বললে,—দাঁতে একটু সুড়সুড়ি না লাগতেই ত ফুরিয়ে গেল! আর এক ধামা আনান!

আনাচ্ছি।—শিবু হাত বাড়িয়ে দিলে,—একটা আধুলি ছাড়ুন দেখি?

আধুলি!—সুশীল চাকী প্রথমে হেসেই খুন। তারপর বললে, —আমার মন্তর কি জানেন? আজ ধার কাল নগদ। ট্রাম-ভাড়ার বেশী একটি ফুটো পয়সা নিয়ে কখনো বেরোই না। আর আমি বার

করব আধুলি আপনাদের ভূত ভোজন করাবার জন্যে। আপনাদের ওই ঘনাদা যাতে এসে ভাগ বসাতে পারেন।

চাপা রাগে তোতলা হয়ে যাবার ভয়ে যখন এ-কথার জবাব দিতে দ্বিধা করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে নিচের সিঁড়িতে ও কার পায়ের আওয়াজ?

হ্যাঁ, ঘনাদারই। ঘনাদার পায়ের আওয়াজ নিচে থেকে বারান্দায় এসে থামল।

তারপর? সে আওয়াজ কি আবার তেতালার দিকেই উঠবে?

না, ঘনাদা সশরীরে ঘরের ভেতরই ঢুকলেন! কিন্তু এবার? শ্রীমান সুশীল চাকীকে কোন মন্তর পড়ে যদি অদৃশ্য করে দিতে পারতাম!

কিন্তু তার দরকার হল না। এ আরেক ঘনাদা যেন! সুশীল চাকীর মত তুচ্ছ একটা মশা কি মাছি যাঁর নজরেই পড়ে না।

ঘরে ঢুকে তাঁর আরাম-কেদারাটিতে নিজে থেকে বিনা অনুরোধে গা এলিয়ে দিয়ে বললেন,—একটু ভিজে গেলাম হে!

ঘনাদার জামাকাপড়ে জলের ছিটেফোঁটা থাক বা না-থাক, আমরা শশব্যস্ত হয়ে উঠলাম।

অ্যাঁ! ভিজে গেলেন!

ঠাকুর, শীগ্‌গির গরম গরম চা এক কেটলী।

একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে নেবেন?

শিশিরের বাড়িয়ে-ধরা টিন থেকে সিগারেট তুলে নিতে নিতে ঘনাদা আমাদের আপ্যায়নে খুশি হয়ে কী বলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে আবার সুশীলের সেই ভিমরুলের হুল?

একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকলে হত না?

আপনার জন্যেই ডাকাতে বোধ হয় হবে!—বলতে পারলে খুশি হতাম। তার বদলে অতিকষ্টে নিজেকে সামলে বললাম,—অ্যাম্বুলেন্স? কেন?

বাঃ, বৃষ্টিতে এরকম ভিজলে হাসপাতাল ছাড়া গতি আছে!—হাড়-জ্বালানো সেই বাঁকা হাসির সঙ্গে সুশীল চাকী সহানুভূতি জানালে,—কি গেরো এখন দেখুন ত! শুধু একটা ছাতা যদি নিতেন!

নিয়েছিলাম। একজনকে দান করতে হল।

আমরা সবিস্ময়ে ঘনাদার দিকে তাকালাম। না, স্বপ্ন নয় সত্যি! ঘনাদা ক্ষেপে উঠে তেতালায় রওনা হন নি। নির্বিকার ভাবে সুশীল চাকীর কথার জবাব দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ছেন।

ছাতা আপনি দান করে এলেন!—সুশীলের দাঁতে তখনও বিষ—আহা কি দয়ার শরীর! নিজের ছাতা পরকে দিয়ে ভিজে আসা···

নিজের ছাতা নয়।—ঘনাদার সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদে সুশীলের সঙ্গে আমরাও হতভম্ব।

নিজের ছাতা নয়, মানে?—এবার সুশীলের গলায় বিষের চেয়ে বিস্ময়ই বেশি, সেই সঙ্গে কেমন একটু সন্দিগ্ধ ভাব।

মানে নিজের ছাতা আমার নেই। বুকিত বরিসানের সিংগালান টাণ্ডিকাট থেকে বিশ বছর আগে একটা লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস বেঁধে ফেলে দেবার পর আর ছাতা কিনি নি।

সুশীল ভ্যাবাচাকা খেয়ে যতক্ষণে মুখের হাঁ বন্ধ করেছে, তার আগেই আমরা ঘনাদাকে ঘিরে বসে গেছি।

ছাতাটা তাহলে ফেলে দিতেই হল?—গৌর উস্কে দেবার ত্রুটি করলে না।

সিগ্‌ন্যাল ডাউন না কি বললেন!—শিশির বোকা সাজল ঘনাদার উৎসাহ বাড়াতে,—তাই রেলের লাইনেই ফেলতে হল বুঝি ছাতাটা?

রেলের লাইন নয়, সিংগালান টাণ্ডিকাট।—ঘনাদা করুণাভরে সকলের দিকে চেয়ে বললেন,—সুমাত্রার একপেশে শিরদাঁড়ার

মত যে পর্বতমালার নাম বুকিত বরিসান তারই এই বিশাল আগ্নেয়-গিরির চূড়ো।

ওঃ, আগ্নেয়গিরি!—শিবু এতক্ষণে বুঝদারের ভঙ্গিতে বললে,—ওই ছাতা ফেলেই আগ্নেয়গিরির আগুন নিভিয়ে ফেললেন বুঝি?

অন্য দিন হলে এরকম বেয়াদবীতে সব ভেস্তে যেত। কিন্তু ঘনাদা তখন একেবারে মাটির মানুষ।

স্নেহের হাসি হেসে বললেন,—না, আগুন নেভাবার দরকার ছিল না। সেটা মরা আগ্নেয়গিরি। ছাতা ফেলেছিলাম···

এতক্ষণে জিভের সাড় ফিরে পেয়ে শ্রীমান চাকী কড়া গলায় জানতে চাইলে,—তার আগে একটা কথা বলুন দিকি···

ছাতায় কি যেন একটা বেঁধেছিলেন বললেন?—সুশীল চাকীর কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিলাম।

লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস!—ঘনাদা যেন চাকীকেই উদ্দেশ করে ওই বিদঘুটে শব্দের পট্‌কাটি ছাড়লেন।

প্রথমে চমকে উঠে চাকী, তারপর মুখ চোখ লাল করে বললে,—আমায় যদি কিছু বলবার থাকে ত বাংলায় বলবেন।

ওর বাংলা হয় না। ঘনাদার নির্বিকার জবাব,—খোলসহীন এক জাতের শামুক দেখেছো কখনো? ভিজে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বড় পাথর কি কাটা গাছের গুঁড়ির তলায় থাকে? ও হল সেই বস্তু।

যে বস্তুই হোক, ওসব প্রাণিতত্ত্বের বিদ্যে আপনার কাছে শিখতে আসি নি। আমি জানতে চাই···

চাকীর কথাটাকে আবার চট্‌পট্‌ সাইড লাইনে শানটিং করে দিতে হল। ব্যস্ত হয়ে উজবুকের মত জিজ্ঞাসা করলাম,—ওখানে ওইরকম ছাতায় শামুক বেঁধে ফেলতেই বুঝি গেছলেন?

না, গেছলাম ওরাং পেণ্ডেক খুঁজতে।

চাকী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘনাদা তাকে আর সে সুযোগ দিলেন না। আমাদের প্রশ্নটা নিজেই অনুমান করে নিয়ে বলে

চললেন,—ওরাং-ওটাং-এর নাম শুনেছ, চিড়িয়াখানাতে দেখেও থাকবে। ওরাং-ওটাং ওই সুমাত্রা বোর্নিও ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে এখনো যে চার জাতের এপ্ বা নরবানর আছে, তার দুটির বাস আফ্রিকায় আর দুটির যাকে ইন্দোনেসিয়া বলে, সেই সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যে। আফ্রিকায় পাওয়া যায় সিম্পাঞ্জি আর গরিলা, আর এই ইন্দোনেসিয়ায় ওরাং-ওটাং আর গীবন বা উকু। এ চারটি ছাড়া আর কোন জীবন্ত 'এপ্' পৃথিবীতে এখনো পাওয়া যায় নি। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা মানুষের 'এপ্'-জাতীয় অন্য সুদূর জ্ঞাতি এখনো পৃথিবীর কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। যেমন,—আমাদের হিমালয়ের দুর্গম তুষার রাজ্যে ইয়েতি আর সুমাত্রার গহন পাহাড়ী জঙ্গলে ওরাং পেণ্ডেক।

ইয়েতির মত ওরাং পেণ্ডেকও প্রাণী হিসেবে প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। জ্যান্ত বা মরা একটা নমুনা কেউ এখনো পায় নি, কিন্তু তারা যে এখনও আছে তার প্রমাণ অজস্র। সুমাত্রার গায়ো ল্যাম্পঙ্ জাম্বী প্রভৃতি জংলী জাতিদের কাছে ওরাং পেণ্ডেকের বর্ণনা এখনো শোনা যায়। একশ বছর আগেও সুমাত্রার তখনকার প্রভু ওলন্দাজেরা অনেকে এ প্রাণী চাক্ষুষ দেখেছেন বলেছেন।

ওরাং পেণ্ডেক জীবিত কি মৃত একটা পেলে বিজ্ঞানের জগতে হুলুস্থুল পড়ে যাবে সত্যি, কিন্তু যে অঞ্চলে ও প্রাণীটিকে পাওয়া সম্ভব, সেখানে প্রাণ হাতে নিয়ে ছাড়া তখন যাওয়া যেত না। বিশ-বাইশ বছর আগের কথা। ওলন্দাজেরা তখনো সুমাত্রার রাজা। বুকিত বরিসান, অর্থাৎ সুমাত্রার পর্বতমালার কাছাকাছি অধিকাংশ জায়গাই তখন দুর্গম বিপদসঙ্কুল। বাঘ, হাতি, গণ্ডার, সাপ ত আছেই। তারপর দুর্দান্ত সব জংলী জাত, যাদের হাতে বিদেশী কারুর নিস্তার নেই।

আমার ও অঞ্চলে যাবার বছরখানেক আগেই বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ডাঃ সাপিরো ওই অঞ্চলেই নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তিনি ওরাং পেণ্ডেক

খুঁজতে ওখানে গেছলেন কিনা কেউ জানে না, তবে সেই মহাযুদ্ধের সময়েও ইওরোপের বৈজ্ঞানিক মহলে তাঁর এই অন্তর্ধান নিয়ে বেশ একটু সাড়া পড়েছিল। রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচার মত আমার সুমাত্রায় যাওয়ার পেছনে ওরাং পেণ্ডেক খোঁজার সঙ্গে ডাঃ সাপিরোর সন্ধান করার তাগিদও ছিল। তার কারণ এই অভিযানে যাবার আগে ডাঃ সাপিরো আমায় গোপনে একটি পার্শেল পাঠিয়ে এমন একটি চিঠি লিখেছিলেন যা অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

নানা জায়গায় খোঁজ করতে করতে তখন রাকান নদী যেখান থেকে বেরিয়েছে, সেই পাহাড়ী জঙ্গলে কদিনের জন্যে ডেরা বেঁধে আছি। সঙ্গে শুধু তাঁবু বইবার দুজন গায়ো অনুচর। শ্রাবণ মাসের প্রায় মাঝামাঝি। সুমাত্রায় সর্বত্রই সারা বছর যেমন বৃষ্টি আর তেমনি গরম। এই অঞ্চলে শুধু এই সময় মাস দুয়েক গরম থাকলেও বৃষ্টি থাকে না।

রাত তখন বেশী নয়। আলো নিভিয়ে তাঁবুর বাইরে বসে জোনাকীর বাহার দেখছি। সুমাত্রার এই জোনাকীর তুলনা নেই। রাত্রের আকাশে ঝাঁক বেঁধে তারা যেন রাশি রাশি উড়ন্ত ফুলঝুরি ছড়িয়ে ছড়িয়ে যায়।

হঠাৎ পেছনে দড়ি-দড়া ছিঁড়ে তাঁবুর ওপর কি একটা পড়ে যাবার শব্দ পেলাম।

চমকে উঠে দাঁড়ালাম। সুমাত্রার দু-শিঙওয়ালা গণ্ডারই তাঁবুর ওপর পড়ল নাকি!

টর্চটা জ্বেলে দেখলাম, গণ্ডার নয়, তবে প্রায় সেইরকমই বিশাল ষণ্ডা চেহারার একটি মানুষ! এদেশী কেউ নয়। সাদা চামড়ার সাহেব।

আমার টর্চের আলোয় অত্যন্ত অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে ছেঁড়া তাঁবুর ওপর থেকে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি বললেন,—মাপ করবেন। আপনার তাঁবুটা বোধহয় ছিঁড়ে ফেলেছি।

তা বেশ করেছেন। কিন্তু আপনি কে, আর এখানে আমার তাঁবুর ওপর কি করে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন জানতে পারি?

আমার নাম বোথা—ভদ্রলোক আমতা-আমতা করে জানালেন, —আমি ডাঃ সাপিরোর খোঁজে···

ডাঃ সাপিরোর খোঁজে! দাঁড়ান! দাঁড়ান!—বলে তাঁকে থামিয়ে আমি অনুচরদের ডেকে তাঁবুটা আবার খাটিয়ে আলো জ্বালার হুকুম দিলাম।

তাঁবু আবার খাড়া করে আলো জ্বেলে বোথার সমস্ত বিবরণই তারপর শুনলাম। বোথা আমার মতই ডাঃ সাপিরোর খোঁজ করতে এই অঞ্চলের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বললেন। মজার কথা এই যে, ডাঃ সাপিরোর সঙ্গে তাঁর সহকারী হিসেবেই এ অঞ্চলে তিনি এসেছিলেন। তারপর এক জায়গা থেকে চলে আসবার সময় দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়। সেই থেকে ডাঃ সাপিরোকে বোথা আর দেখেন নি। ডাঃ সাপিরোও হয়ত বোথাকে খুঁজে না পেয়ে একা-একাই ইওরোপে ফিরে গেছেন মনে করে বোথা তাঁর দেশে ফিরে যান। কিন্তু সেখানে অনেকদিন অপেক্ষা করেও ডাঃ সাপিরোকে ফিরতে না দেখে আবার সুমাত্রায় এসেছেন খোঁজ করতে।

কিন্তু ডাঃ সাপিরোর সঙ্গে যেখানে আপনার ছাড়াছাড়ি হয় সে জায়গা খুঁজে দেখেছেন ত?—আমি একটু অধৈর্যের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলাম।

সে জায়গাটা পেলে তো খুঁজে দেখব?—বোথা অসহায় ভাবে জানালেন।

তার মানে?

তার মানে সেটা সাধারণ কোন জায়গা নয়, একটা মরা আগ্নেয়-গিরির এমন একটা বিরাট গভীর গহ্বর ভেতর থেকে, যার চারদিকের খাড়া পাহাড়ে ওঠা মানুষের অসাধ্য। বাইরে থেকে মাথা পর্যন্ত ওঠা গেলেও সেখান থেকে খাড়া ন'হাজার ফুট নামা অসম্ভব।

বছরের মাত্র কটি দিন একটা সঙ্কীর্ণ আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথে সেখানে যাওয়া-আসা যায়।

বছরের মাত্র কটা দিন কেন?

কারণ সেটা একটা পাহাড়ী ঝরনার উৎসমুখ। সারা বছর সেখান দিয়ে প্রচণ্ড বেগে জলের ধারা বেরিয়ে আসে। আগস্ট মাসের প্রথম কটি দিন মাত্র সে সুড়ঙ্গপথ শুকনো থাকে।

আগস্টের ত আর দেরি নেই। এখনো সে সুড়ঙ্গপথ আপনি খুঁজে পান নি?

সে পাহাড়টা না পেলে সুড়ঙ্গপথ খুঁজব কি করে! বোথা হতাশ ভাবে বললেন,—এখানে সমস্ত 'বুকিত বরিসান'-এই ওরকম বহু মরা আগ্নেয়গিরি আছে বাইরে থেকে যা দেখতে একরকম। কোথায় কোন্‌টা দিয়ে বেরিয়েছি তখন তাড়াহুড়োতে কি অত খেয়াল করেছি! ডাঃ সাপিরো যে তার ভেতর আটকে থাকতে পারেন তাও ভাবিনি। অবশ্য ডাঃ সাপিরো সেখানেই আছেন কিনা এখনো জানি না।

একটু হেসে বললাম,—আপনার ভাবনা নেই। তিনি সেখানেই আটকে আছেন। আজই খবর পেয়েছি।

খবর পেয়েছেন!—বোথা হতভম্ব হয়ে বললেন,—কিন্তু তাঁর সঙ্গে রেডিও-টেডিও কিছু ত নেই!

রেডিওর চেয়ে নিশ্চিত খবরই তিনি পাঠিয়েছেন। ওই তাঁর খবর এল আবার।

বাতিটার কাছেই রাখা একটা ছোট কাঁচের বাটির ওপরে দুটো 'মথ' পোকা ঘুর ঘুর করে পাখা নাড়ছিল। তারই একটা ধরে বোথাকে দেখালাম।

একবার 'মথ'-টার আর একবার আমার মুখের দিকে যেভাবে বোথা তাকালেন, তাতে বুঝলাম আমার মাথা কতখানি খারাপ তিনি আন্দাজ করবার চেষ্টা করছেন।

হেঁসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম,—এটা কি 'মথ' জানেন?

রেশম যারা তৈরী করে সেই 'বম্বিক্স মোরি'-র চীনে শাখা। সুমাত্রার এই জঙ্গলে ও 'মথ' কোথাও নেই। সুতরাং নিশ্চিন্ত থাকুন। ডাঃ সাপিরো যেখানে বন্দী, সে পাহাড় কাছেই আছে নিশ্চয়। কালই তা খুঁজে বার করব।

কিন্তু,—চাকীকে মুখিয়ে থাকতে দেখেও গৌর আমাদের সকলের হয়ে প্রশ্নটা করেই ফেলল,—ওই বোম্বে মেরী না কি বললেন, ওই মথ ডাঃ সাপিরোর পোষা বুঝি?

বোম্বে মেরী নয়, 'বম্বিক্স মোরি'। আর পোষা-টোষা কেন হবে! ঘনাদা ধৈর্য ধরেই বোঝালেন,—মেয়ে-মথের গায়ে এমন একটা গন্ধ থাকে, পুরুষ-মথ সাত মাইল দূরে থেকেও যা পেয়ে ছুটে আসে। ওই কাঁচের বাটিতে মেয়ে-মথের সেই গন্ধ জমানো ছিল। ও গন্ধ এমন যে তার একটি অণু-ই ঠিক বিশেষ জাতের পুরুষ-মথকে টেনে আনবে। ডাঃ সাপিরো আমায় তাঁর শেষ পার্শেলে এই রেশমী মথের গন্ধ-জমানো আঁটা শিশি পাঠিয়ে চিঠিতে তার ব্যবহার লিখে জানিয়েছিলেন। সুমাত্রায় জংলীদের হাতে কোথাও বন্দী হবার ভয়ই তাঁর ছিল। তাই কোথায় আছেন জানাবার এমন ফন্দি তিনি করেছিলেন যা জংলীরা ধরতে পারবে না। বছরখানেক তাঁর খবর না পেলে ওই গন্ধসার নিয়ে সুমাত্রায় তিনি আমায় খুঁজে দেখতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর নিজের সঙ্গে সেই জন্যে শুধু রেশমী পোকার গুটি নিয়েছিলেন বেশী করে, যা ফেটে ওই 'বম্বিক্স মোরি' বার হবে।

বোম্বাই বাহাদুরী ত খুব শুনলাম, এখন আমার—ঘনাদা একটু থামতেই চোখ মুখ পাকিয়ে চাকী তাঁকে চেপে ধরবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু তার কথা আর শেষ করতে হল না।

তারপর সেই পাহাড়ও পেলাম, সেই সুড়ঙ্গপথও—ঘনাদা গলার জোরেই চাকীকে চেপে দিয়ে শুরু করলেন—জলের শুধু একটু ঝির-ঝিরে ধারা তলায় থাকলেও সে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথ যেমন অন্ধকার

তেমনি পেছল। কোন রকমে পা টিপে টিপে দেওয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে সে সুড়ঙ্গ পার হতেই এক দিন এক রাত লেগে গেল। অন্ধকারে ওইরকম সুড়ঙ্গে বেশীক্ষণ থাকলে মানুষের মেজাজ বোধ হয় বিগড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। বোথার সঙ্গে অন্ধকারে একবার ঠোকাঠুকি হওয়ার পর তিনি ত খিঁচিয়েই উঠলেন,—একটা টর্চ সঙ্গে নিতে পারলেন না! তার বদলে কি সব ছাতা পুঁটলি আজে-বাজে জিনিস নিয়ে চলেছেন!

টর্চ ত আপনিও নিতে পারতেন!—অন্ধকারে অদৃশ্য বোথার উদ্দেশেই ঝাঁঝিয়ে বললাম,—পথ হারিয়ে ত সেদিন আমার তাঁবুতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, সঙ্গের মালপত্র সব খোয়া গেছে। কিন্তু ওই কি-সব সস্‌প্যান ঝাঁঝরি হাতা গোছের সরঞ্জাম ত ঠিক সঙ্গে আছে দেখছি। ওখানে যজ্ঞির রান্না রাঁধবেন নাকি!

সুড়ঙ্গপথে বোথার একটু মেজাজই শুধু দেখেছিলাম। সেখান থেকে ভেতরে গিয়ে পৌঁছোবার পর তার একেবারে মারমূর্তি।

অপরাধের মধ্যে আমি শুধু বলেছিলাম,—আপনি ত এখন ডাঃ সাপিরোর খোঁজেই ঘুরবেন, আমি তাহলে সোনাদানা যা পাই ততদিনে বাগিয়ে ফেলি।

সোনাদানা!—বোথা প্রথমে চমকে উঠে কেমন হতভম্ব হয়ে গেলেন।

বললাম,—হ্যাঁ, কুবেরের গুপ্ত ভাঁড়ারের মত এখানে যে সোনার ছড়াছড়ি মনে হচ্ছে। বালি কাঁকর চালাচালি করে যা বার করবার জন্যে ওই সব প্যানট্যান অত কষ্ট করে বয়ে এনেছেন। ওগুলো আমাকেই দিয়ে যান।

তোকে দিয়ে যাব!—মরা আগ্নেয়গিরি যেন বোথার ভেতর দিয়েই জ্বলে উঠল,—কালা গুবরে পোকা! তোকে দেবার জন্যেই এগুলো বয়ে এনেছি!

বাঃ, আমায় দেবেন না!—আমি যেন কাঁদো-কাঁদো,—আমি তাহলে কি করতে এখানে এলাম?

শোন্ তাহলে আরশোলা, তোকে সঙ্গে এনেছি অন্ততঃ বছর-ভোর এখানে কয়েদ রাখতে। কালই এখান থেকে পালাবার শেষ দিন। আজই না পারি সোনা যোগাড় করে কাল আমি তোকে ফেলে চলে যাবো। বছরভোর যদি টিকে থাকিস্, আর দিন গুনতে ভুল না করিস্, তাহলে আর-বছরে আবার এখান থেকে বেরুতে পারবি। ততদিনে এ জায়গায় সোনা তোলবার দখল আমি সুমাত্রার সরকারের কাছে পাকা করে ফেলেছি। তোর জন্যেই এ পাহাড়টা চিনতে পেরেছি বলে তোকে এই প্রাণে বাঁচবার সুবিধেটুকু দিলাম, নইলে তোর মত ছারপোকাকে এখানে টিপে মেরে যাওয়াই আমার উচিত ছিল।

খুব মন দিয়ে কথাগুলো শুনে কাতরভাবে বললাম,—কিন্তু আমি যে আপনাকেই এখানে এক বছর বন্দী করে রাখবার ফন্দি এঁটে এলাম। তারিখ-দেওয়া আপনার ডায়েরীটা সরিয়ে ফেললাম যাতে দিনের হিসেব রাখতে আপনার অসুবিধে হয়· ·

তুই! তুই আমার ডায়েরী চুরি করেছিস্!—বোথার মুখ দিয়ে তখন ফেনা উঠছে।

নিজের ঝোলাটা পাগলের মত খুঁজতে খুঁজতে সে বললে,—ডায়েরী যদি না পাই তাহলে তোর হাত-পা আমি একটা একটা করে ছিঁড়ব, তোকে পা বেঁধে উপর থেকে ঝুলিয়ে আগুনে ঝলসাবো; কালা কেন্নো তোকে···

আহা সামলে সামলে!—বোথাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলাম,—এক বছর এখানে থেকে আরো সব ভালো ভালো শাস্তি কল্পনা করবার অঢেল সময় পাবেন। তারপর বেরিয়ে এসে আমায় খবর দেবেন। তখন আপনার সঙ্গে না হয় আপনার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন কি জোহানেসবার্গে যাবো। অন্য

কোথাও কালা আদমীর ওপর এমন সুবিচার করবার সুবিধে ত আর পাবেন না। আপনি যে আসল ওলন্দাজ নন, দক্ষিণ আফ্রিকার—

বোথার ঝোলা খোঁজা তখন শেষ হয়েছে।

আমার ডায়েরী তুই—তুই—বলে রাগে তোতলাতে তোতলাতে সে ক্ষ্যাপা হাতির মতই আমার দিকে তেড়ে এল।

আরে! আরে মারবেন নাকি!—বলে ছুটে খানিকটা নিচে নেমে গেলাম।

তারপর চলল শিকার আর শিকারীর খেলা। সে আমাকে ধরবার জন্যে তেড়ে আসে, আমি একটু ছুটে পালাই বা চট করে সরে গিয়ে তাকে পাশ কাটাই।

হাতের কাছে পেয়েও ধরতে না পেরে বোথা তখন রাগে উন্মাদ হয়ে গেছে। কিন্তু উন্মাদেরও দম আর কতক্ষণ থাকে! বিশাল শরীর নিয়ে আমার পেছনে ছুটে ছুটে ঘণ্টাখানেক বাদে হাপরের মত হাঁফাতে হাঁফাতে সে ক্লান্তিতেই লুটিয়ে পড়ল।

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম,—বড্ড পরিশ্রম হয়েছে, না? একটু জিরিয়ে নিন্। কেন যে মিছিমিছি ছোটাছুটিটা করলেন?

বিরাট থাবার মত হাত দিয়ে খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে প্রাণপণে টানবার চেষ্টা করে সে হিংস্র উল্লাসে এবার বলে উঠল,—এইবার—?

তার হাতটাই তার মাথার ওপর টেনে রেখে বললাম,—এবার মাথা ঠাণ্ডা করে যা বলছি শুনুন। কাল নয়, আজই আমি চলে যাচ্ছি। কারণ সুড়ঙ্গপথ কাল আর খোলা থাকবে না। গত দু-বছর ধরে বছরে মাত্র দুটি দিন ও সুড়ঙ্গপথ শুকনো থাকে। এখুনি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রওনা হতে না পারলে ওই সুড়ঙ্গে জলের তোড়ে ডুবে মরতে হবে।

মিথ্যা কথা !—আমার হাতটা হয়রান হয়ে ছেড়ে দিয়ে বোথা গর্জে উঠলেন,—তুই ! তুই এসবের কি জানিস্ ?

আমি কিছু জানি না। তবে ডাঃ সাপিরো দু'বছরে যা জেনেছেন তাই বলছি।

ডাঃ সাপিরো !—বোথার ফ্যাকাশে মুখ এবার দেখবার মত।

হ্যাঁ, যাঁর সহকারী হয়ে এসে এখানে সোনার সন্ধান পেয়ে লোভে একেবারে পিশাচ হয়ে উঠেছিলেন।

পকেট থেকে একটা দড়ি বার করে আচমকা বোথার হাত দুটো ধরে ফেলে পিছমোড়া করে বাঁধতে বাঁধতে তারপর বললাম,—যাকে এমনি করে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখে সোনার নমুনা নিয়ে একা সুড়ঙ্গপথে পালিয়ে গেছলেন।

কে ? কে এসব কথা বলেছে ?—বোথার গলায় আর যেন তেজ নেই। হাতের বাঁধন খোলবার চেষ্টা করতেও তিনি ভুলে গেছেন।

কে আর বলতে পারে ডাঃ সাপিরো ছাড়া !—হেসে বললাম,—আপনার সঙ্গে দেখা হবার আগের দিনই ওই 'মথ'-এর খবর পেয়ে তাঁকে আমি এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছি। তারপর আপনার জন্যেই তাঁবু পেতে অপেক্ষা করছিলাম।

আমার জন্যে ?

হ্যাঁ, আপনি যে সোনার নমুনা নিয়ে দেশে গিয়েছিলেন যাচাই করাতে, তারপর এই কুবেরের ভাণ্ডার ঠিকমত চিনতে না পেরে এক বছর যে এই অঞ্চলে পাগলের মত ঘোরাঘুরি করছেন, সবই আমার জানা। আমার ওপর সন্দিগ্ধ নজর রেখে আমায় একবার বাজিয়ে নিতে আপনি আসবেনই আমি জানতাম। তাই অপেক্ষা করে ছিলাম ডাঃ সাপিরোকে যা করেছেন তার উপযুক্ত শাস্তি আপনাকে দেবার জন্যে। তবে শাস্তি আর এমন কি ! যে সোনার জন্যে আপনি সব করতে পারেন, সেই সোনার রাজ্যেই আপনাকে রেখে গেলাম। আশ মিটিয়ে এখন বালি কাঁকর ছেঁকে সোনা বার করুন।

পিছমোড়া করে যে বাঁধন দিয়েছি, ওই ওখানাকার পাথরের ধারে ঘণ্টা দুয়েক ঘষলেই সেটা ছিঁড়ে যাবে। ততক্ষণে আমি অবশ্য সুড়ঙ্গপথে অনেক দূরে চলে গেছি! আপনার কিন্তু বেরুবার আর তখন সময় থাকবে না।

কথাগুলো বলে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই বোথা হাঁকুপাঁকু করে কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ককিয়ে উঠলেন,—কিন্তু আমার ডায়েরী নেই। হিসেবে ভুল হলে এক বছর বাদে আমি বার হব কি করে?

বার হবেন না। আর এক বছর না হয় এইখানেই থাকবেন। ডাঃ সাপিরো দু'বছর এইখানে কাটিয়েছেন আপনারই শয়তানিতে।

না, না,—বোথা যেন ডুকরে উঠলেন,—আমি সোনা চাই না, কিছু চাই না, আমায় শুধু এখান থেকে বেরুতে দাও।

বেশ. বেরুতেই পারবেন!—আমি হেসে বললাম,—কিন্তু এক বছরের আগে তা হয় না। এ শাস্তি আপনার পাওনা। এক বছর বাদেই যাতে বার হতে পারেন তার ব্যবস্থা করছি।

কি ব্যবস্থা?—বোথা হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করলেন।

এই ছাতাটা দেখছেন—ছাতাটা খুলে ধরে বললাম,—আর ওই পাহাড়ের দেওয়ালের পূব দিকের মাথাটা দেখুন।

আমি যেন তাঁর সঙ্গে নির্মম পরিহাস করছি এইভাবে বোথা একবার ছাতাটা আর একবার পাহাড়ের মাথার দিকে চাইলেন।

হেসে আবার বললাম,—ভয় নেই আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছি না। পাহাড়ের ভেতর দিকটা এমন খাড়া যে ওঠা অসাধ্য, কিন্তু বাইরের দিকটা ঢালু। সেখান দিয়ে উঠে ওই পূব দিকের মাথা থেকে এই খোলা ছাতাটা নিচে ফেলব। সেই ছাতায় বাঁধা থাকবে বছর হিসেব করবার নির্ভুল জ্যান্ত ঘড়ি।

বছর হিসেব করবার জ্যান্ত ঘড়ি!—বোথা হতভম্ব।

হ্যাঁ, 'লিমাক্স ফ্ল্যাভাস্'—খোলসহীন এক জাতের শামুক। পৃথিবীতে প্রলয় হতে পারে তবু ওই প্রাণীটি বছরে একবার ঠিক পয়লা কি দোসরা আগস্ট ডিম পাড়বেই। ছাতা থেকে খুলে নিয়ে ওই শামুকের ওপর নজর রাখবেন। তারিখ ভুল আর হবে না।

বোথা যত বড় শয়তানই হোক, তাকে যা কথা দিয়েছিলাম তা রেখেছিলাম। কুড়ি বছর আগে পাহাড়ের চূড়া থেকে 'লিম্যাক্স ফ্ল্যাভাস্' বেঁধে সেই যে নিজের ছাতাটা মরা আগ্নেয়গিরির তলায় ফেলে দিয়েছিলাম, তারপর আর ছাতা কিনি নি।

কথা শেষ করেই ঘনাদা শিশিরের সিগারেটের টিনটা অন্যমনস্ক-ভাবে হাতে নিয়ে বারান্দার দিকে পা বাড়ালেন।

চাকী ফাঁক পেয়ে পেছন থেকে চীৎকার করে উঠল,—নিজের ত নেই, আজ কার ছাতা দান করে এলেন শুনি?

জানি না।—ঘনাদা তেতালার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলে গেলেন।

তারপর হুলুস্থুল ব্যাপার। চাকী সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠল,—আমার ছাতা! আমার ছাতা এখানে শুখোতে দিয়েছিলাম!

সবাই মিলে তাকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে গেলাম।

ওঃ, আপনার ছাতাটাই গেছে বুঝি? কার যে কখন কি যাবে কিছু ঠিক নেই এখানে।

তার মানে?—চাকী চিড়বিড়িয়ে উঠল,—যে যারটা যখন খুশি নিয়ে যাবে! আবার দান করেও আসবে!

দুঃখের সঙ্গে জানালাম,—এ মেসে ওই নিয়ম!

* * *

চাকী দু-মাসের অগ্রিম টাকা রিফাণ্ড নিয়ে মেস ছেড়ে গেছে।

ঘনাদা কুলপি খান না

ঘনাদা বললেন,—না।

আমরাও সবাই হাঁ।

ঠাণ্ডা গরম কোন রকম লড়াই চলছে না, বাইরে সাদা মেঘের হ্যাণ্ডবিল ছড়ানো শরতের আকাশ যেমন পুজোর বাজারের মত প্রসন্ন, ক-দিন ধরে আমাদের বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের আবহাওয়াও তাই।

এই গোলমেলে সময়েও শিবু ট্রেনে করে প্রথমে গড়িয়াহাট, তারপর সোনারপুর, শেষ ক্যানিং পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে চিংড়ি, ভেটকি, এমনকি গাঙের ইলিশ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। সরষের তেলের অভাবটা বাদাম তেলে সরষের গুঁড়ো মিশিয়ে টের পেতে দেওয়া হয় নি। শিশির একটা করে নতুন সিগারেটের টিন একদিন অন্তর খুলে আর হিসেব রাখছে না, ঘনাদা দু-বেলা আমাদের আড্ডা-ঘরে নিজে থেকে হাজিরে দিয়ে এ-পর্যন্ত গালগল্পের দু-চারটে মাত্র ফুলঝুরি ছাড়লেও, তুবড়ি পটকার আশায় আমরা সমানে জল উঁচু জল নিচু মেপে তাঁর সঙ্গে তাল দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ তাহলে ঘনাদার এমন ঘাড় বাঁকাবার কারণ কী?

আর বেঁকে দাঁড়ালেন কিসে?

শহরের সেরা আইসক্রীমে!

অনেক ভেবেচিন্তে এ আইসক্রীমের ব্যবস্থা করেছিলাম। পাড়ার বিখ্যাত তেলেভাজার ওপর আর ভরসা নেই। সরষের তেল যখন মহাজনের গোডাউনে নারকেল তেলের টিনে অজ্ঞাতবাস করছে,

তখন তেলেভাজা খেতে মোবিল না সায়ানাইড কি পেটে যাবে ঠিক কী? বড় রাস্তার রেস্তোরাঁর চপ-কাটলেটও চোখ বুজে আর মুখে ফেলবার নয়। সামনেই কাঠের আড়ত। আর কিছু না হোক সেখানকার করাতের গুঁড়ো এ-বাজারে কাজে লাগতেও তো পারে।

অনেক বিচার-বিবেচনা করে তাই শহরের সেরা কোম্পানির কুলপি মানে আইসক্রীম আনিয়েছিলাম আজ বিকেলে।

এ-কুলপিতে ছিটেফোঁটার বদলে গল্পের একটা বড় চাঁই যদি জমে এই আশা।

বনোয়ারী বড় ট্রেতে আইসক্রীমের প্লেটগুলো সাজিয়ে আনতেই ঘনাদার চোখে একটু ঝিলিক দেবে ভেবেছিলাম।

তা তো নয়ই! একসঙ্গে দু-দুটো টুটি ফ্রুটি সমেত সবচেয়ে বড় প্লেটটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতেই ঘনাদা যেন রবিবর্মার ছবির বিশ্বামিত্রের মত মেনকার কোলে শকুন্তলাকে দেখে শিউরে উঠে নিষেধের হাত তুলে মুখ ফেরালেন।

সে কী ঘনাদা!—শিশির অবাক হয়ে বললে,—আইসক্রীম খাবেন না?

একেবারে বাজারের সেরা কুলপি-বরফ,—শিবু পঞ্চমুখ হয়ে উঠল,—ম্যাগলিটি থেকে স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে আনানো। জিভে ঠেকতে না ঠেকতে প্রাণ মন জুড়িয়ে যায়। এ-কুলপি খাবেন না!

না।—ঘনাদার এই সংক্ষিপ্ত যুক্তাক্ষরবর্জিত প্রত্যাখানেই আমরা একেবারে হাঁ।

গৌর তবু একবার ওকালতি করে দেখল,—এ আর সেই মাটির হাঁড়ির ময়দা-আঁটা টিনের খোলের নোংরা কুলপি নয়। দস্তুরমত বৈদ্যুতিক যন্ত্রে তৈরী। হস্ত দ্বারা অস্পৃষ্ট। একটু শুধু চেখেই দেখুন না।

ভবী তবু ভোলবার নয়। সামনে যেন নিমের পাঁচন ধরা হয়েছে

এমনিভাবে মুখ বেঁকিয়ে ঘনাদা হাতের শুধু কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা নেড়ে সরিয়ে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলেন।

বরফ খেলে দাঁত কনকন করে বুঝি?—মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে যেতেই তটস্থ হয়ে উঠলাম। ঘনাদার বাঁধানো দাঁত ধরা পড়ার সে-কেলেঙ্কারি তো ভোলবার নয়। তারপর থেকে সাবধানে সে-উল্লেখ আমরা এড়িয়েই যাই। আজ হঠাৎ আমার ভুলেই না ঘনাদা আরামকেদারা ছেড়ে উঠে পড়েন।

বেফাঁস কথাটা সামলাতে যাচ্ছি হঠাৎ শিশির যেন আমার বেআদবির খেই ধরেই উল্টো হাওয়া দিয়ে বসল।

না না, দাঁত কনকন নয়, ঘনাদা ওই পেল্লায় ম্যাগনাম সাইজ দেখেই ভয় পাচ্ছেন। বরফ তো নয়, যেন একজোড়া কোলবালিশ!

ঘনাদা আর অত বড় বরফ দেখেন নি কখনো?—শিবু শিশিরকে বকুনি দেওয়ার ছলে একটু খোঁচা লাগাল।

দেখবেন না কেন?—গৌর আর একটু ফুটিয়ে দিলে,—বরফের দোকানে কাঠের গুঁড়ো-মাখানো চাঁই দেখেছেন। তার বেশি তো কিছু নয়।

কেন?—আমি সরল প্রতিবাদ জানালাম,—দুনিয়া এস্পার-ওস্পার করে ঘনাদা একটা আইসবার্গও দেখেন নি কখনো! এই ত সেবার সেই ছড়ির কল্যাণে দক্ষিণ-মেরু থেকে বেঁচে ফেরবার পথে আইসবার্গের ওপরই পড়েছিলেন।

আকাশে আজ দু-চারটা হাল্‌কা সাদা মেঘ ছাড়া কিছু নেই। কালো মেঘগুলো সব ঘনাদার মুখেই এসে জমছে টের পাচ্ছিলাম। আমি শঙ্কিত হলেও গৌর কিন্তু তাতেও যেন ভ্রূক্ষেপ না করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে,—হ্যাঁ, ওই আইসবার্গ পর্যন্তই বলতে পারো।

আইসবার্গটা বুঝি কিছু না!—ঘনাদার মান বাঁচাতে আমাকেই কোমর বাঁধতে হল,—সেটা কত বড় হবে ঘনাদা?

উৎসুকভাবে ঘনাদার দিকে চোখ কপালে তোলবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাকালাম। আইসবার্গটা এভারেস্ট না ছাড়াক আল্পস্ কি অ্যাণ্ডিজকে লজ্জা দেবে-ই নিশ্চয়।

কিন্তু একেবারে যেন থাবড়া দিয়ে বসিয়ে ঘনাদা নিজেই নিতান্ত অবজ্ঞার সুরে বললেন,—কত আর! শ দুইফুট উঁচু হবে বড় জোর। সঙ্গে সঙ্গে ঘনাদা উঠে পড়েন আর কি!

আমি এবার হতাশ, কিন্তু প্রথম ছেঁকা যে দিয়েছিল সেই শিশিরই মলম লাগিয়ে নরম গরমে এমন বাজিমাত করবে কে ভেবেছিল!

হঠাৎ খুক্ খুক্ করে দু-বার কেশে নিয়ে শিশির বললে,—গলাটা কেমন খুসখুস করছে। যা ডেঙ্গুর মরশুম চলেছে। গলার জন্যে একটা কিছু খেলে হয়।

আমার ঘরে থ্রোট-প্যাস্টিল্ আছে। আনাব নাকি ঘনাদা?

ঘনাদা প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। আবার আরাম-কেদারায় একটু সোজা হয়ে বসে বললেন—তা থাকে যদি আনাও।

আর ভাবছি,—শিশির এখন রাস্তা পেয়ে গেছে বোঝা গেল। দু-গ্রাসে নিজের প্লেটের আইসক্রীমটা সাবাড় করে মুখ চোখের কাহিল অবস্থাতেই করুণ সুরে বললে,—এ-সব বরফ-টরফ এখন না খাওয়াই ভালো। বাজারের কিছুতে তো বিশ্বাস নেই। রামভুজকে না হয় কটা অমলেট ভাজতেই বলি।

বলো।—ঘনাদা এবার কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন যেন নির্লিপ্তভাবে।

সেই সঙ্গে ক-কাপ গরম কফি?—গৌর ফরমাশ করলে।

ঘনাদার মুখ থেকে আষাঢ়ের মেঘগুলো সরছে বলেই মনে হল। হঠাৎ আবার শিশিরের বেয়াড়া খোঁচা।

ঠাণ্ডাটা আপনার সয় না, না ঘনাদা?

ঘাটে লাগতে লাগতে নৌকো বুঝি বানচাল হয়ে যায়!

কিন্তু বিপরীতেই হিত হয়ে গেল যেন ফুস-মন্তরে।

ঘনাদা তাঁর সেই পেটেণ্ট নাসিকাধ্বনি ছেড়ে বললেন,—হ্যাঁ, তেমন আর সয় কই! শুনেছি দক্ষিণ মেরুর অভিযানে রাশিয়ানরা ভোস্টকে মাইনাস একশ পঁচিশ ডিগ্রি পেয়েছে। সেটা আমার দেখবার সৌভাগ্য এখনো হয় নি। তবে পারার থার্মোমিটার পাথর হয়ে জমে অচল হয়ে গেছল।

থার্মোমিটারের পারা জমে গেছল!—স্বাভাবিক বিস্ময়ের সঙ্গে উস্কানি দেবার জন্যেও মুখব্যাদান করতে হল,—কত ঠাণ্ডা তাহলে?

কত ঠাণ্ডা বুঝবেন কী করে?—গৌর ধমক দিল,—শুনছিস থার্মোমিটার জমে গেছল!

না, পারার থার্মোমিটার জমলেও ঠাণ্ডা মাপা যায়!—ঘনাদার অনুকম্পা-অবজ্ঞার দৃষ্টি যত জোরালো, আমাদের আশাও সেই অনুপাতে প্রবল,—পারা জমে শক্ত হয়ে যায়,—৩৮°তে, তারপর অ্যালকোহল থার্মোগ্রাফ দরকার হয়। সে অ্যালকোহল থার্মোগ্রাফে তখন মাইনাস সত্তর।

মাইনাস সত্তার! গৌর বিনা চেষ্টাতেই চোখ কপালে তুলল,—কোথায়?

দ্রাঘিমা ৪২·১২° পূর্ব-অক্ষাংশ, উত্তর ৭২·৩৫°।

বলা বাহুল্য ঘনাদার এই সরল সংক্ষিপ্ত সমাচারে আমরা সবাই অথই পাথারে।

শিবুই প্রথম সামলে উঠে দু-বার ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলে—উত্তর অক্ষাংশ বলছেন না? তার মানে আলাস্কা-টালাস্কা কি ল্যাপল্যাণ্ড-আইসল্যাণ্ড বুঝি?

না। গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তর-পুবে সাড়ে-আট হাজার ফুট, যাকে আইস-ক্যাপ বলে সেই বরফের একটা চাঁই-এর উপর।

সাড়ে-আট হাজার ফুট বরফের চাঁই।—ঘনাদা গৌরের

বেআদবির জবাব দিলেন বুঝে বিস্ফারিত নয়নে জিজ্ঞেস করলাম, —সেখানে মানুষ থাকে ?

না, থাকে না। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের মধ্যে মানুষের বসতি নেই বললেই হয়। জায়গাটা সুমেরুবৃত্তেরও চারশ মাইল উত্তরে। গ্রীনল্যাণ্ডের সবচেয়ে দক্ষিণের ঘাঁটি ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ থেকে প্রায় হাজার মাইল। উত্তর মেরুও হাজার মাইলের কিছু বেশি। সেটা আই. জি. ওয়াই. মানে ইণ্টারন্যাশন্যাল জিওলজিক্যাল ইয়ার বলে কয়েক মাসের জন্যে এই বরফের শ্মশানে একটি বৈজ্ঞানিকের দল কাছাকাছি কোথায় একটা ঘাঁটি বসিয়ে একটা রাত কাটাতে এসেছে এইটুকু শুধু জানতাম।

ঘনাদা ভাষণ থামিয়ে আমাদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলোলেন। তাঁর ঠোঁটের বাঁকা হাসিটুকুর মানে না বুঝে আমি বেশ একটু অবাক।

গৌরই আমাদের আমাদের মুখরক্ষা করলে। ভুরু কুঁচকে বললে,—কয়েক মাস ধরে এক রাত কাটাচ্ছে, মানে ওখানে সেই ছ-মাস দিন, ছ-মাস রাত তাহলে ?

ঠিক ধরেছ।—ঘনাদা কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়ে বললেন,—তখন সেই রাত দুপুর চলছে। সূর্যের মুখ দেখা যায় না, শুধু একবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আকাশটা একটু পরিষ্কার হয়। তবে মাঝে-মাঝে উত্তর আকাশে যেন বৈদ্যুতিক আতসবাজির উৎসব লেগে যায়।

অরোরা বোরিয়ালিস।—শিশির তার বিদ্যা জাহির করেই বোধ হয় বিবাদ বাধালে।

হ্যাঁ, ওই বোরিয়ালিসের ভূতুড়ে আলোয় এক বিশাল 'সাস্‌ক্রুজি'-র ওপর দিয়ে তখন দূরের এক 'মুনাটাক' লক্ষ্য করে চলেছি।

দাঁড়ান। দাঁড়ান।—শিশিরের বাহাদুরির খেসারত দিতে বাধ

হয়েই অজ্ঞতা স্বীকার করে ঘনাদাকে থামাতে হল,—ও-সব শাস্ত্রীজি আর নুন টুন আবার কী?

শাস্ত্রীজি নয়, সাসক্রুজি, আর নুন টুন নয়, নুনাটাক।—ঘনাদা কৃপা করে ব্যাখ্যা করলেন,—সাস্‌ক্রুজি হল ঢেউ-খেলানো বরফের প্রান্তর আর নুনাটাক হল পাহাড় গোছের পাথুরে ঢিবি। প্রথম কথাটা রুশ ভাষার, দ্বিতীয়টা এস্কিমোদের থেকে পাওয়া। ওই কথাগুলোই এখানে চালু।

একটু থেমে আমাদের কুপোকাৎ অবস্থাটা উপভোগ করে ঘনাদা বলতে শুরু করলেন,—গায়ে ভাল্লুকের চেয়ে ধোক্কড় পোশাক—পশমের পা-গেঞ্জি, হাত-গেঞ্জি, তার ওপর পশমের শার্ট, পাজামা, পর-পর দু-জোড়া গরম মোজা, ভেতরে রেশনের লাইনিং দেওয়া পশমের পার্কা, তার ওপর ক্যারিবো হরিণের লোমওয়ালা চামড়ার প্যান্ট আর বল্গাহরিণের লোমশ চামড়ার বড় পার্কা আর মাথাঢাকা টুপি, পায়ে সীলের চামড়ার জুতো, দু-হাতে পশমের দস্তানার ওপর বল্গাহরিণের চামড়ার আর একটা দস্তানা, মুখে তুষার বাঁচাবার গগল্‌স-আঁটা মুখোশ—তা সত্ত্বেও মুখে গলায় যেখানে একটু ফাঁকা, সেখানে যেন অসংখ্য অসাড়-করা ছুঁচ ফুটছে।

গ্রীনল্যাণ্ডের এই বরফের প্রান্তরে ঠিক তুষারপাত যাকে বলে তা খুব কমই হয়। সাদা ঢেউ-খেলানো শূন্যতার ওপর দিয়ে সারাক্ষণ অসহ্য একটা গোঙানি-তোলা ঝোড়ো হাওয়া এলোমেলো ভাবে বয়, আর তাতে একটু-ফুটলেই-কালিয়ে-দেওয়া বরফের অগুনতি ছুঁচ যেন সূক্ষ্ম ক্ষ্যাপা ভোমরার ঝাঁকের মত উড়ে বেড়ায়।

এইভাবে কয়েক পা আরো এগিয়েই সামনের সেই ফাটলটা দেখতে পেলাম। বরফের প্রান্তর দু-ফাঁক করে কত হাজার ফুট অতলে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই। ওপরেই ফাটলটা এদিক থেকে ওদিক প্রায় চোদ্দ ফুট চওড়া।

আমার পেছনে পেরীনও যে এসে দাঁড়িয়েছে, অরোরা বোরিয়া-লিসের ভুতুড়ে আলোর ফেলা ছায়া দেখেই বুঝলাম।

পেছন না ফিরেই জিজ্ঞাসা করলাম,—এবার কী করবেন সেনর পেরীন? এ ক্রেভ্যাস্ কতদূর লম্বা কিছু তো বোঝবার উপায় নেই। অথচ এটা পার না হলে তো আপনি যে নুনাটাক দেখাচ্ছেন সেখানে পৌঁছান যাবে না। এই দু-মণি পোশাক নিয়ে পারবেন লাফ দিয়ে পার হতে।

লাফ দেবার দরকার হবে না।—স্নো মাস্ক-এর ভেতর দিয়েই সেনর পেরীনের জলদগম্ভীর গলা শোনা গেল,—এখান থেকেই ফিরে যাব ভাবছি, আর একলাই ফিরব।

একলাই ফিরবেন!—যেন কথাটা ঠাট্টা মনে করেই গ্রাহ্য না করে হেসে উঠে নিচু হয়ে তার দিকে পিছন ফিরে বসে অতল ফাটলটা ভালো করে পরীক্ষা করতে করতে বললাম,—কী ভয়ঙ্কর ফাটল দেখেছেন! মনে হয় সোজা আট হাজার ফুট সেই পাতালে নেমে গেছে।

হ্যাঁ।—পেছন থেকে আমার প্রায় ঘাড়ের ওপরে পেরীনের বাজখাঁই গলা শোনা গেল এবার,—একটা কেলে গুবরে পোকার পক্ষে গোরটা একটু বেশি জমকালো হয়ে যাচ্ছে। সাড়ে আট-হাজার ফুট বরফের পিরামিড মিশরের ফারাওরাও ভাবতে পারে নি।

যেন রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললাম,—আপনার হঠাৎ এ-রকম ঠাট্টার মানে তো বুঝতে পারছি না, সেনর পেরীন! আপনার প্রাণ সংশয় বলে সাহায্য করবার জন্যে আমায় ডেকে নিয়ে এলেন। তখন গোপনে বললেন যে 'এস. এ. এস'-এর এই ট্র্যান্স-পোলার ফ্লাইটের জেট হঠাৎ বিকল হয়ে এভাবে আইস-ক্যাপের ওপর নামার পেছনে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র রয়েছে। প্লেনটা প্রায় নিরাপদেই নামলেও প্রথম ধাক্কায় আপনার পাশের সীটের ভদ্রলোক

মিঃ হিগিন্‌সের হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক নয়। আপনাকে ঘায়েল করতে গিয়েই শত্রুরা সামান্য ভুলে নাকি মিঃ হিগিন্‌স্‌কে জখম করে বসেছে। শত্রুরা প্লেনের ভেতরেই যাত্রী না কর্মচারী সেজে আছে—আপনি বুঝতে পারেন নি বলেই তাদের ভয়ে আপনি প্লেন ছেড়ে পালাবার এই ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছেন। এখানে আই. জি. ওয়াই.-এর বৈজ্ঞানিকদের একটা ঘাঁটি বসেছে বলে আপনার জানা আছে। প্লেন সামান্য যেটুকু জখম হয়েছে, তা সারাবার ফাঁকে আপনি আমার সাহায্য চেয়েছেন সেই ঘাঁটি খুঁজে বার করবার জন্যে। সীমাহীন তুষারের এই ধুধু জনমনিষ্যিহীন তেপান্তরে সে অজানা ঘাঁটি খুঁজে না পাওয়ার মানে যে কী তা বুঝেও জেনেশুনে এত বড় বিপদ ঘাড়ে নিয়ে আপনার সঙ্গী হয়েছি, আর আপনি কিনা এ-রকম বিশ্রী ঠাট্টা করছেন!

আচ্ছা, ঠাট্টা আর করব না তাহলে।—অরোরা বোরিয়ালিস্‌-এর ভূতুড়ে আলোর রং-বেরং-এর মায়া-পর্দা দোলানো সেই গাদা তুষারের অসীম মহাশ্মশানে ছুঁচ-ফোঁটানো হাওয়ার অবিরাম গোঙানি ছাপিয়ে যেন সাক্ষাৎ যমদূতের মত পেরীনের বুক-কাঁপানো হাসি শোনা গেল। তারপর হাসি থামিয়ে সে চাপা গর্জন করে বললে,—শোন্‌ তাহলে হতভাগা। বরফের পিরামিডের তলায় কবর দেবার আগে তোকে সত্যি কথাগুলো শুনিয়ে দি। তুই আমায় চিনতিস্‌ না, কিন্তু তুই যে হিগিন্‌স্‌কে পাহারা দেবার জন্যে এ-প্লেনে যাচ্ছিস্‌, তা আমি জানতাম। এ জেট প্লেন যে হঠাৎ বিকল হয়ে এই আইস-ক্যাপের ওপর নেমেছে সে আমাদেরই কারসাজিতে। এ প্লেনের ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আমাদের হাতের মুঠোয়। তারই কৌশলে প্লেনের ইঞ্জিন হঠাৎ বিগড়ে গেছে।

কিন্তু প্লেনের ইঞ্জিন বিগড়ে দিয়ে এই জনমানবহীন বরফের রাজ্যে নামতে বাধ্য করায় লাভটা কী? আমি যেন হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

লাভটা এখনো বুঝতে পারিস নি ?—পেরীন হায়নার হাসি হেসে বললে,—লাভ এক ঢিলে দু-পাখি সাবাড় করা। প্লেনটা বেকায়দায় নামাবার সময় সামান্য যেটুকু ঝাঁকুনি লেগেছে তারই সুযোগ নিয়ে পাশে থেকে মাথায় ঘা দিয়ে বুড়ো হিগিনস্‌কে বেহুঁশ করেছি। তারপর গোলমালের মধ্যে তার অ্যাটাচিটাই তুলে নিয়ে টয়লেটে গিয়ে ঢুকেছি। সেখানে যা দরকার বার করে নিয়ে তার জায়গায় অন্য কাগজপত্র রেখে অ্যাটাচিটা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়েছি। ফ্লাইট অফিসার আর ইঞ্জিনিয়াররা তখন প্লেন থেকে নেমে বাইরে মেরামতের কাজে লেগেছে। এবার তোর একটা ব্যবস্থা না করলে নয়! বাইরের পোশাকগুলো এয়ার-ব্যাগে ভরাট ছিল। আর-একবার টয়লেটে গিয়ে সেগুলো প'রে ফেলেছি। প্লেনের ভেতরে যেখানে সত্তর ডিগ্রি তাপ বাইরে সেখানে মাইনাস সত্তর। ওই গোলমাল না হলে অফিসাররা কেউ বাধা দিত। একজন স্টুয়ার্ডেস চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু পোশাক দেখিয়ে তাকে বুঝিয়ে নিচে নেমেছি। তুই যে আগেই নিচে নেমেছিস তা দেখেছি। নিচে তোকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে এই আজগুবি বিপদের কাহিনী শুনিয়েছি। এত সহজে আহাম্মকের মত তুই এ-ফাঁদে পা দিবি তা সত্যি আশা করি নি। তখন রাজী না হলে অন্য উপায়ে তোকে সাবাড় করবার ব্যবস্থা করতে হ'ত।

তাহলে আপনার বিপদ, আই. জি. ওয়াই.-এর ঘাঁটি খোঁজার কথা, সব মিথ্যে!—আমি যেন দিশাহারা।

তোর মত একটা গবেটকে যারা হিগিনস্‌কে আগলাবার জন্যে পাঠিয়েছে তাদের বুদ্ধিকেও বলিহারি!—পেরীন যেন গায়ে থুতু দেবার মত করে বললে,—এই পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল ধুধু বরফের রাজ্যে আই. জি. ওয়াই.-এর একটা কুঁড়ের মত আস্তানা খুঁজে বার করা, খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে বার করার চেয়ে যে শক্ত সে হুঁশটুকুও তোর হয় নি। কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। প্লেন বোধহয়

এতক্ষণে চালু হয়ে এসেছে। তোর কবরের ব্যবস্থা করে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে এবার।

সত্যি একলাই ফিরে যাবেন!—আমি যেন সমস্ত ব্যাপারটা এখনো বিশ্বাস করতে না পেরে ভ্যাবাচাকা,—ওরা যখন আমার কথা জিজ্ঞাসা করবে?

আমায় জিজ্ঞেস করবে কে?—পেরীন খেঁকিয়ে উঠল,—আমার সঙ্গে তোকে আসতে কেউ দেখেছে? তুই যে নেই এ-গোলমালে তা কেউ খেয়ালই করবে না। খেয়াল পরে কোনো সময়ে অবশ্য হবে, কিন্তু তখন প্লেন উত্তর মরু পেরিয়ে বোধহয় প্রশান্ত মহাসাগরের নাগাল পেয়েছে। তুই তখন সব খোঁজাখুঁজির বাইরে।

এই ফাটলেই তাহলে ফেলে দেবেন বলছেন!—হতাশ করুণ সুরে বলে ফাটলটা আর একবার দেখবার জন্যেই যেন পেরীনের দিকে পিছু ফিরলাম।

সেই মুহূর্তে পেরীন বুনো মোষের মত পেছন থেকে সজোরে ঠেলা দিলে।

তৈরীই ছিলাম। তবু হাত বাড়িয়ে ধরে না ফেললে পেরীন সেই হাঁ-করা পাতালে বোধহয় তলিয়েই যেত।

ধরে-ফেলা তার হাতটা ফাটলের পাড়ে বরফের একটা খোঁজে লাগিয়ে দিয়ে বললাম,—শক্ত করে ধরুন সেনর পেরীন। আপনার যা দু-মণি বালির বস্তার মতো লাশ তাতে আগেই যদি বরফের পাড় ধসে না যায়, তাহলে মিনিট পাঁচেক অন্তত টিকে থাকতে পারবেন।

প্রাণপণে দু হাতে বরফের খাঁজটা ধরে অতল ফাটলের ওপর ঝুলতে ঝুলতে পেরীন ভয়ে-কাঁপা ধরা গলায় কোনো রকমে বললে,—আমি—আমি—

হ্যাঁ, আপনি আমার জন্যে ভালো সমাধিরই ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আমার মত সামান্য একটা পোকামাকড়ের পক্ষে এমন সমাধি

একটু বেমানান নয়? বরফের পিরামিডটা আপনার কবরেরই মান রাখবে।

আমি আর ধরে থাকতে পারছি না!—এবার একটু দম পেয়ে পেরীন আর্তনাদ করে উঠল,—আমায় বাঁচাও। এবার আমি তোমাকে অনেক অনেক টাকা দেব। এত টাকা তুমি ভাবতে পারো না।

সত্যি বলছেন?—আমি যেন একটু দোমনা,—কিন্তু টাকার আমার ভাবনা কী! আপনার পকেটেই যে-কটা কাগজ চুরি করে রেখেছেন সেগুলো পেলেই তো আমি টাকা রাখবার জায়গা পাব না।

পাড়ের ধার থেকে ঝুঁকে পেরীনের পার্কা থেকে শুরু করে সাতপুরু জামার তলায় হাত চালিয়ে তার শার্টের ভেতরের পকেট থেকে খামে-ভরা কাগজগুলো বার করে নিয়ে বললাম,—কিছু মনে করবেন না। কখন আপনি এ-ফাটলে তলিয়ে যান কিছু ঠিক নেই তো, তাই এগুলো আগেই বার করে নিলাম।

আমার হাত অবশ হয়ে আসছে!—পেরীনের এবার প্রায় ডুকরে কান্না,—আপনাকে দিব্যি গেলে বলছি, নিজে থেকে আমি ধরা দেব, সব ষড়যন্ত্রের কথা কবুল করে যারা যারা এর ভেতর আছে ধরিয়ে দেব। আমায় বাঁচান!

দেখুন দিকি!—বড় ফাঁপরেই যেন পড়লাম,—আট হাজার ফুট ফাটলে নামিয়ে দিচ্ছিলেন,-এখন আবার তুই থেকে আপনিতে তুলে লজ্জা দিচ্ছেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা জানাবার জন্যে আপনাকে বাঁচাবার দরকারই নেই যে! আপনার মত নিরেট আহাম্মক বেইমানকে যারা এ শয়তানি কাজ হাসিল করতে নিয়েছিল, তাদের বুদ্ধিকে বলিহারি। আপনি কি ভাবেন ষড়যন্ত্রের কথা জানতে আমাদের কিছু বাকি আছে। হিগিন্‌স্‌কে আগলাতে নয়, আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যেই আপনার পেছনের সীটে জায়গা নিয়ে চলেছি। ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার আপনাদের হাতের মুঠোয় বলে ইঞ্জিন

বিগড়ে দিয়ে এই বরফের শ্মশানে প্লেন নামাবার ব্যবস্থা করে নি। সে যাকে বলে ডাব্‌ল এজেন্ট, মানে আমাদেরই চর। আপনাদের দলের লোক সেজে এতদিন আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে। এ অমূল্য কাগজ চুরির ষড়যন্ত্রের কথা জানা থাকলেও হাতেনাতে ধরবার জন্যেই যেন আপনারই সুবিধে করতে প্লেন এখানে নামানো হয়েছে। ঘটে যদি আপনার একটু বুদ্ধি থাকত তাহলে আমায় প্লেনের বাইরে এই সব পোশাকে দেখেই আপনার সন্দেহ হ'ত। সাধারণ প্লেনের যাত্রী হয়ে গ্রীনল্যাণ্ডের ওপর ঘোরাফেরার পোশাক কেউ সঙ্গে রাখে না। এ আইস-ক্যাপে আই. জি. ওয়াই.-এর ঘাঁটি যে এখন ধারে-কাছে নেই তা আমি জানি। আপনার মিথ্যে ধাপ্পা অত সহজে বিশ্বাস করে যে আপনার সঙ্গে এসেছি সে শুধু আপনার দৌড় দেখবার জন্যে। মিঃ হিগিন্‌স্‌ও আপনার চোরা মারে অজ্ঞান হন নি। এই রকম কিছু হতে পারে আন্দাজ করেই তাঁর গায়ে বুলেট-প্রুফ বর্মা আঁটা, আর মাথায় শক্ত ইস্পাতের আঁটো টুপির ওপর পরচুলা লাগানো। তিনি শুধু অজ্ঞান হবার ভান করে ছিলেন। কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনার হাত দুটো অসাড় হয়ে এসেছে বুঝতে পারছি। ভাবছি এত কষ্ট যার জন্যে করলেন সেটা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এ ক্রেভ্যাস কত গভীর জানি না। যতই হোক, তলায় গিয়ে খামটা খুঁজে নিতে পারবেন।

লেফাফাটা তারপর সেই ফাটলের মধ্যেই ফেলে দিলাম।

অ্যাঁ! ওই অমূল্য কাগজগুলো ফেলে দিলেন!—আমাদের সকলের চোখই ছানাবড়া!

হ্যাঁ,—ঘনাদা নির্বিকার,—ফেলে দিতে ওই অবস্থাতেও পেরীনও প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছিল। তাকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত ফাটল থেকে তুলে প্লেনে নিয়ে গিয়ে হাতকড়া পরাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

কিন্তু সেই দামী কাগজগুলো?—আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা।

আসল কাগজ তো ছিল আমার পকেটে।—ঘনাদা ঈষৎ দন্ত বিকাশ করলেন,—মিঃ হিগিন্‌সের অ্যাটাচিতে যা ছিল তা ফাঁকি।

কিন্তু ও অমূল্য কাগজে ছিল কী?—আমি কৌতূহল চাপতে পারলাম না।

স্পেস-রকেটের নতুন নক্সা!—শিবু আঁচ করলে।

নিউট্রন বোমার অঙ্ক!—গৌরের কল্পনা।

উঁহু, আধুনিক কটা ছবি!—শিশিরের মন্তব্য।

না,—ঘনাদা আমাদের সংশয় মোচন করলেন,—ছিল 'লেজের'-এর নতুন কূট কৌশল।

লেজের!—আমরা হতভম্ব।

হ্যাঁ,—ঘনাদা সদয় হয়ে ব্যাখ্যা করলেন,—এল. এ. এস. ই. আর.। মানে, লাইট অ্যাম্পলিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিসন অফ রেডিয়েশন। সংক্ষেপে ইংরেজী আদ্যক্ষরগুলো নিয়ে লেজের, একারটা খাটো। আর বর্গীয় জ-টা জানতি পার না-র মত। আজগুবি বিজ্ঞান-কাহিনীর লেখকরাও যা কল্পনা করতে পারে নি, 'লেজের' এ-যুগের মাত্র সেদিনের '৯৬০ সালের সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। এ এমন তীব্র তীক্ষ্ণ আলোর রেখা যে দশ মাইল দূরে ফেললেও কয়েক ফুট মাত্র ছড়ায়। এ আলো দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সূর্যের লক্ষ লক্ষ গুণ উত্তাপ সৃষ্টি করা যায়। এ আলোর রেখা মারফত বেতারের চেয়ে ভালোভাবে মানুষের কণ্ঠ আর যে-কোন ছবি পাঠানো যায়। একটা এ আলোর রেখা এই ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে যেখানে যত টেলিফোনের আলাপ হচ্ছে সব বইতে পারে। প্রথম যে 'লেজের' যন্ত্র তৈরী হয় তাতে চুনি-র ভেতর দিয়ে শুধু একটি রঙের লাল আলোই বার হ'ত। আর্গন, ক্রীপ্টন গোছের গ্যাস ব্যবহারের কৌশলে এখন অন্তত ষাট-সত্তর রঙের 'লেজের' আলো বার করবার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। সেই আশ্চর্য উদ্ভাবনের খসড়া নিয়েই মিঃ হিগিন্‌স্ বিলেত থেকে আমেরিকায় যাচ্ছিলেন।

এ অমূল্য কাগজ চুরি যাবার ভয়েই সঙ্গে থাকতে হয়েছিল আমায়।

কিন্তু এ আশ্চর্য উদ্ভাবনের কৌশল শুধু ওই কটা কাগজেই লেখা থাকবে কেন?—গৌরের বেয়াড়া প্রশ্ন,—সঙ্গে করে তা নিয়ে যাবারই বা দরকার কী? 'টপ্ সিক্রেট' ডাকেই তো তা পাঠাবার কথা!

ঘনাদার কাছে কোনো উত্তর আর পাওয়া গেল না। বনোয়ারী তখন রামভুজের সদ্য-ভাজা গরম অমলেটের প্লেট নিয়ে হাজির হয়েছে।

ঘনাদা তারই ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

গলা-ব্যথার লজেঞ্জও রয়েছে ঘনাদা!—শিশির জানাল।

ঘনাদার ভর্তি গাল থেকে যে অস্পষ্ট আওয়াজ বেরুল তা মনে করিয়ে দেওয়ায় খুশির, না ধরে ফেলায় বিরক্তির ঠিক বোঝা গেল না।